বেদিয়া-ছন্দ

রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

অগ্রণী বুক ক্লাব
১৬, বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা

লেখকের অন্যান্য বই

কলঙ্কিনীর খাল

বিস্ময়

সবিনয় নিবেদন

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে

সেনা বাহিনী

পরস্ত্রী

কালো তীর (ছোটদের

প্রথম সংস্করণ

আগষ্ট ১৯৪৫

ভাদ্র ১৩৫২

দুই টাকা

প্রচ্ছদপট শিল্পী : শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ : ভারত ফটো টাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

অগ্রণী বুক ক্লাব, ১৬ বৃন্দাবন বসু লেন, কলিকাতা হইতে দেবকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রভু প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

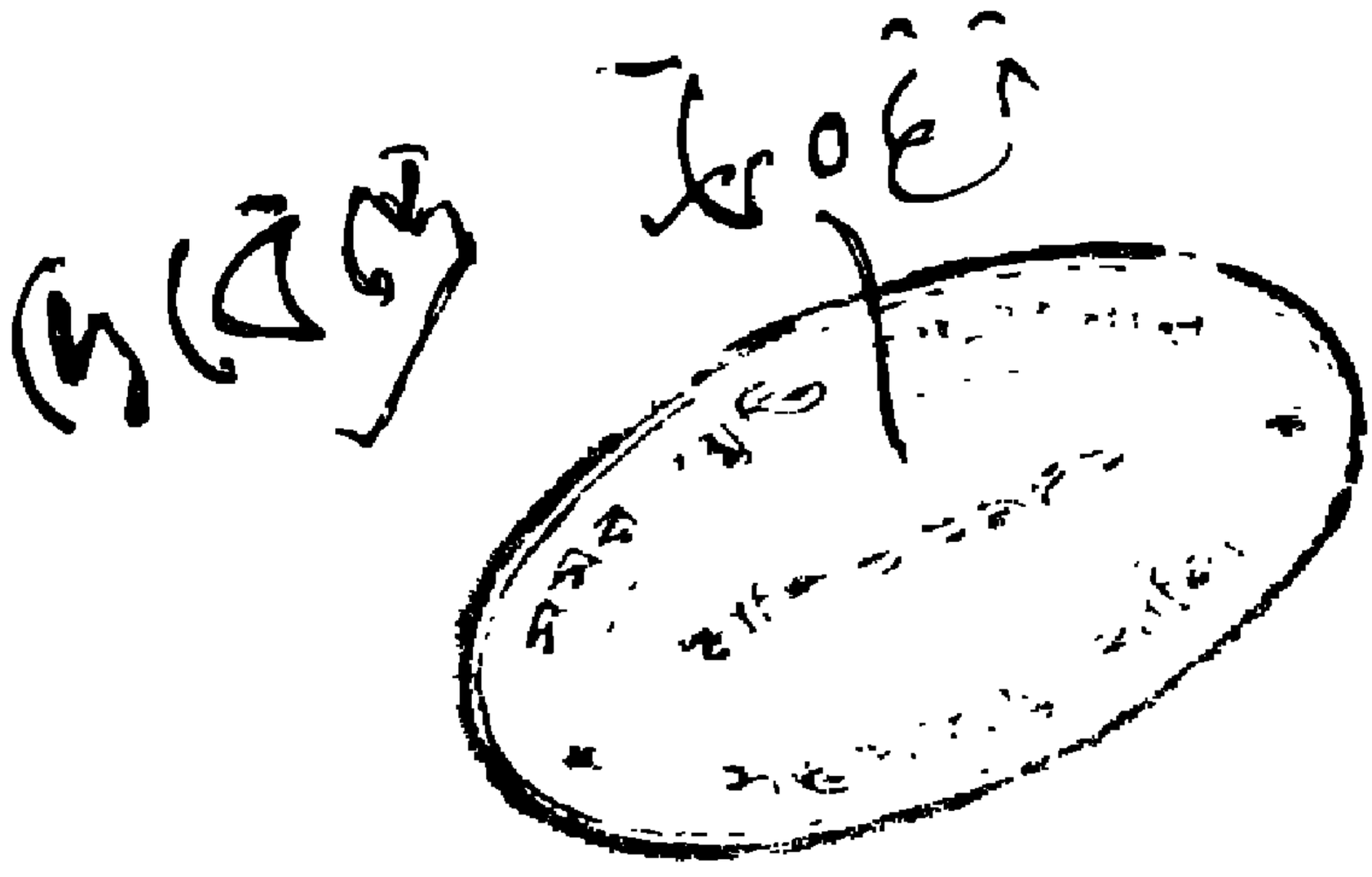

বেদিয়া-ছন্দ

কেয়াবনের পথ,

অন্য শেষ রজনী, প্রায় জানা ছিল,

মঃ নিষাদ, বেদিয়া-ছন্দ, ধূমল বহ্নি, এই সেই ব্যথা তীর্থ,

ছোরা, পরাজিত যোদ্ধা।

সহোদরা শ্রীমতী রেখা চট্টোপাধ্যায়
(গণ্ডা)-কে দিলাম

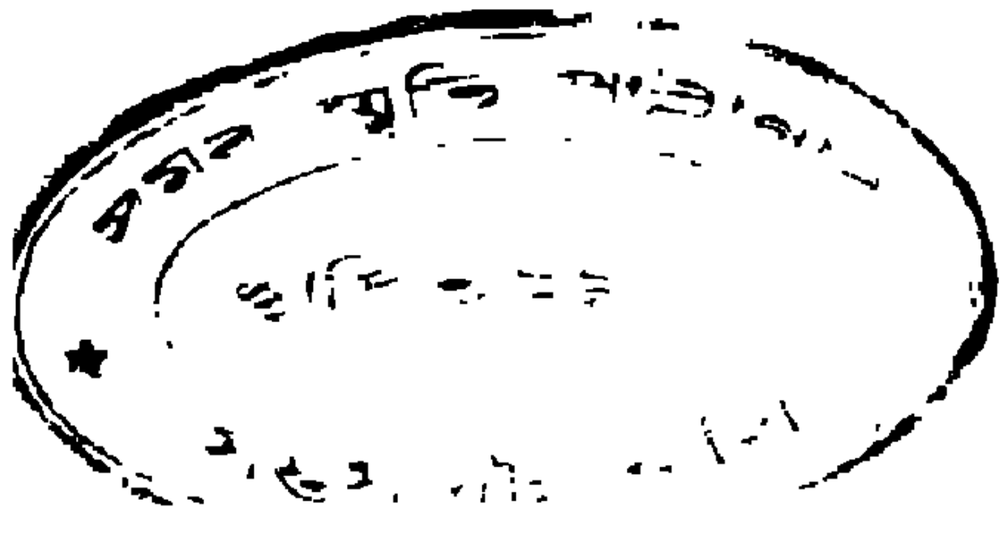

কেয়াবনের পথ

দুই পাশে কেয়ার ঘন বন—তাহারই ভিতর দিয়া নিতান্ত ভয়ে ভয়ে একটি গ্রাম্যপথ রেখার পর রেখা টানিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণপাড়া হইতে উত্তরপাড়া আসিতে হইলে উজানী গাঁয়ের এইটিই সোজা পথ। কিন্তু বেশী রাত হইয়া গেলে এপথ দিয়া চলাচল করিতে স্বতঃই মনে ভয়ের সঞ্চার হয়—কারণ, কবে নাকি একদিন গ্রামের কাহাকে যেন এই পথেই সাপে কামড়াইয়াছিল। অবশ্য, কেয়াবনে সাপ থাকা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। কাজেই ঐ ঘটনা যদি মিথ্যাও হয় তবু ওপথ এড়াইয়া চলাই সুবুদ্ধির পরিচয়, বিশেষ করিয়া যখন একটু ঘুর হইলেও আর একটি ভাল পথ আছে।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসা সত্ত্বেও উত্তরপাড়ার মানি ওরফে মানদা তাহার ছোট ভাই বিজু ওরফে বিজনকুমারকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণপাড়ার মালা ওরফে মণিমালাদের বাড়ি হইতে ঐ পথে আসিতেছিল। মানির দুর্জ্জয় সাহস সত্য, কিন্তু অপরের সাহসের উপর নির্ভর করিয়া সন্ধ্যার পরে ঐ সাপবহুল পথে যাওয়া তো চলে না, কাজেই বিজু ওপথে আসিতে প্রথম রাজি হয় নাই। কিন্তু মানি দুই ধমকে তাহাকে রাজি হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

সে বলিয়াছিল, যা তুই তবে একাই ওপথ দিয়ে, আমি অত ঘুরে এখন যেতে পারি নে। মরণ তোমার! এত রাত পর্য্যন্ত মালাদের বাড়িতে পড়ে থাকা কেন, কি মধু ওখানে আছে শুনি? বাড়ির কথা আর মনে থাকে না, এই পথেই হতভাগা তোমাকে বাড়ি ফিরতে হবে, সাপে বাঘে

কাটে তো কাটুক গে—কাটলে পরে মালাদের বাড়ি এত রাত পর্য্যন্ত আড্ডা মারা তোমার ঘুচে যাবে।

বিজু অমনি পট্ করিয়া আপনার অভিমান ভুলিয়া জিব কাটিয়া বলিয়াছিল, দিদি, 'মা-মনসা' বল্, 'মা-মনসা' বল্ শীগ্‌গির, রাত ক'রে সাপ বলতে নেই রে!

মানির এ-সত্য ভাল করিয়াই জানা ছিল, কিন্তু রাগের মাথায় মা মনসার নাম করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছিল, যে ভুল হইয়া গিয়াছে তাহা শুধরাইয়া লওয়ার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সে বলিয়াছিল, সাপের নাম নিলে মা মনসা যদি চটেন তো চটুন গে। তোর পোড়ারমুখোর জন্যেই না এ-দুর্ভোগ আমার কপালে লেখা ছিল।

অগত্যা বিজু যতটা সম্ভব দিদির গা ঘেষিয়া পথ চলিতে লাগিল। আর মানি তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিল, ভয় করে তো তুই আমার হাত ধ'রে চল না বিজু।

বিজু কি যেন একটু চিন্তা করিয়া লইয়া বলিল, তুই এখন অনেক বড় হ'য়ে গেছিস দিদি, তোর গা ছুঁতে কেন জানি আজকাল ভারি লজ্জা করে। নইলে তোর হাত ধরেই চলতাম বই কি! আমার কিন্তু ভারি ভয় করচে। কেয়াফুলের ভারি মিঠে গন্ধ, না দিদি?

মানি সহসা বিজুর কথায় চকিত হইয়া উঠিল। মানির যে বয়স হইয়াছে তাহা মানি এতদিন ভাবিয়া দেখে নাই। বিজুর কথায় সহসা তাহার আপাদমস্তক কেমন অস্বস্তিকর এক জ্বালায় জ্বলিতে লাগিল। হতভাগা এসব আবার বলে কি!

বিজুর এতক্ষণে খেয়াল হইল যে, কথাটা সে নিতান্ত বেফাঁস বলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু যাহা একবার বলিয়া শেষ করা হইয়াছে তাহা তো আর ফিরাইয়া লইবার কোন উপায় নাই, থাকিলে না হয় তেমন ব্যবস্থা করা যাইত। বিজু আপনাকে বিশেষ রকম বিব্রত মনে করিয়া তাড়াতাড়ি

আবার বলিতে শুরু করিল, আচ্ছা দিদি, ওই মিঠে কেয়ার ঘ্যেরান্ পেয়েই বুঝি মা-মনসা এখানে ঠাঁই নিয়েচেন ?

মানি বিজুর পূর্ব্বোক্ত অপ্রত্যাশিত কথারই রেশ টানিয়া শ্লেষ হানিয়া বলিল, আমি কি সর্ব্বজ্ঞ যে মা-মনসা কিসের জন্যে এখানে ঠাঁই নিয়েচেন তাও ব'লে দিতে পারবো ? তবে বন-বাদাড়েই তো মা-মনসার ঠাঁই।

বিজু দিদির কণ্ঠ শুনিয়াই বুঝিয়াছিল যে, সে তাহার প্রতি একটু চটিয়া গিয়াছে, কিন্তু চটিয়া যাওয়ার বিশেষ কারণ সে তো কিছু আবিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। হুঁ, সত্যই তো দিদির গা ছুঁইতে আজকাল তাহার কেমন যেন একটু লজ্জা করে। দুই দিন আগেও এমন কথা সে ভাবিতে পারে নাই, কিন্তু যেদিন হইতে মানির বিবাহের কথা একটু আধটু কানাঘুষা হইতে শুরু করিয়াছে সেদিন হইতেই কেন জানি বিজু এই দুর্ব্বলতা আপনার মধ্যে অনুভব করিতেছে। ইহার কারণ সে নিজেও ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তবে ইহা সে বুঝিয়াছে যে, দিদির বয়স বাড়িয়াছে। আর সে-কথা বলায় এমনই বা কি অপরাধ হইয়া গেল তাহা তো সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

এমন সময় কেয়াবনের ভিতর হইতে একটা ডাহুক পাখী বোধ করি ডাকিয়া উঠিল। বিজু সভয়ে দিদির আরও কাছে আসিয়া তাহার হাতের কনুইয়ের কাছটা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

মানি বিশেষ রকম চমকাইয়া উঠিয়া ত্রস্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, এই না বড় লজ্জা করছিল তোর হতভাগা, আর যেই ডাহুক ডেকে ওঠা, অমনি ভয়ে বুঝি তোর লাজ-লজ্জা সব চুলোয় গেল বিজু ?

বিজু বিব্রত হইয়া অভিমান জড়িত কণ্ঠে বলিল, আমি তো এপথে এইজন্যেই আসতে চাইনি দিদি, তোর পাল্লায় প'ড়েই তো আসতে হ'ল।

মানি অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিয়া বলিল, দেব এইবার গালে তোর দুই চড় বসিয়ে। হতভাগা, কেন মরতে রাত পর্য্যন্ত মালাদের বাড়ি থাকা

হয় শুনি? বয়স হ'লে যে এতদিনে গাঁয়ে ঢি ঢি পড়ে যেত। আর কখনওও আমি পারবো না তোকে ওদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে—এই আমি আজ ব'লে দিলাম।

বিজু মানির হাতটা আর একটু শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তোকে কে যেতে বলেছিল শুনি? আমি না হয় খেয়ে দেয়ে মালাদের বাড়ি শুয়ে থাকতাম, তারপর কাল ভোরে বাড়ি আসতাম। তুই না এলে আমাদের সেইরকমই তো কথা ছিল।

মানি মনে মনে একটু হাসিল, তারপর ঠাট্টার সুরে বলিল, আমার গা ছুঁতে তোর লজ্জা করে, কিন্তু মালার পাশে শুতে তো লজ্জা করে না।

বিজু মহাবিব্রত হইয়া বলিল, কি জানি, অত জানি নে, তবে মালার তো তোর মত বয়স হয় নি, আর বিয়ের সম্বন্ধও আসেনি যে লজ্জা করবে আমার।

মানি নির্জ্জন কেয়াগন্ধ-কাতর গ্রাম্যপথ হাসিয়া মুখর করিয়া তুলিল।

পরদিন মালা তাহাদের বাড়ি আসিল। বিজু তখন বাড়ি ছিল না। মানি মালাকে দেখিয়াই হাসিতে শুরু করিয়া দিল। মালা মানির অত হাসি দেখিয়া প্রথমটা একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল সত্য, কিন্তু পরক্ষণেই আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মানিদি, আমাকে দেখে তোমার অত হাসি কিসের শুনি?

মানি মালার একটা হাত ধরিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিল, আয় ঘরের ভেতর, তোকে একটা মজার কথা শোনাই।

মালা অতি ভয়ে ভয়ে মানির সঙ্গে একটা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে-ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। মানি মালাকে একটা তক্তপোষের উপর বসাইয়া তাহারই গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিতান্ত ঘনিষ্ঠ

হইয়া বসিয়া মালার কানের কাছে মুখ লইয়া বলিল, কাল রাত্তিরের কাণ্ড শোন তোকে তবে বলি। তোদের বাড়ি থেকে বিজুকে নিয়ে আমি যখন কাল ঐ কেয়াবনের পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, তখন বিজুটা তো সাপের ভয়েই মরে। ওটাকে বল্লাম, তোর যদি ভয় করে তো তুই আমার হাত ধ'রে চল বিজু। কিন্তু এমন হতভাগা ছেলে, বলে কি না, তোর এখন বয়স হয়ে গেছে দিদি,—তোর হাত ধরতে আমার কেমন যেন লজ্জা করে। শোন' কথা ডেপো ছেলের! মানি এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মালার গায়ের উপর হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল, তারপর নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিতে লাগিল, আমি তখন বল্‌লাম. আমার হাত ধ'রে চলতে তোর লজ্জা করে হতভাগা, কিন্তু মালার পাশে শুতে তোর লজ্জা করে না।

বললে তুমি? বলিয়া মালা লজ্জায় আড়ষ্ট হইয়া গেল।

মানি বলিল, হুঁ, বললাম বই কি! আর তাতেই তো ঢিট হ'য়ে গেল একেবারে!

মালা কি যে করিবে এবং কি যে বলিবে ভাবিয়া পাইতেছিল না। মুখের চেহারা তাহার এমন হইয়াছিল যে, মানি সেদিকে চাহিয়া সকৌতুকে মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না। কিন্তু আর বেশীক্ষণ এ কৌতুক উপভোগ করিতে গেলে হয়ত মালা না কাঁদিয়া ফেলিয়া থাকিতে পারিবে না মনে করিয়াই মানি মালার লজ্জা-রঙীন গালে আস্তে ব্যঙ্গ করিয়া টিপিয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা বোকা মেয়ে তো তুই মালা। তাই কি আমি বিজুকে বলতে পারি নাকি? তোকে নিয়ে একটু রগড় করছিলাম।

মালা আশ্বস্ত হইল সত্য, কিন্তু লজ্জা একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না। বলিল, যাও, তোমার যত সব বিচ্ছিরি কথা মানিদি।

তা বটেই তো! বলিয়া মানি উঠিয়া যাইতেছিল এমন সময় কোথা

হইতে বিজু ঝড়ের মত ছুটিয়া সে ঘরে ঢুকিয়াই মালার চুলের মুঠি বাঁ হাতে ধরিয়া পট পট করিয়া তাহার গালে গোটা দুই চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, পোড়ারমুখি তোর জ্বালায় ও-পাড়ায় যে আমার পা ফেলাই দায় হ'ল দেখছি। দশজনের কাছে যে বড় ব'লে বেড়াস, আমি তোর গলায় মালা দেব বলেছি—কবে কোথায় বলেছি শুনি? না, আমি তোর গলায় কিছুতেই দেব না। একটা কলাগাছের গলায় দিতে হয় সেও বি আচ্ছা, তবু তোর মত যার একটা কথাও পেটে থাকে না তার গলায় কিছুতেই না। আবার উনি আমার বদনাম রটিয়ে বেড়াচ্ছেন সর্ব্বত্র।

মানি প্রথম ব্যাপারটা কিছু বুঝিতে না পারিয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না।

বিজুর দিকে আগাইয়া গিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া গালে বেশ করিয়া কয়েক চড় বসাইয়া দিয়া বলিল, সব তাতেই বজ্জাতি তোমার হতভাগা! এক একটা কাণ্ড ক'রে আসবেন নিজেই, কোথায় কি সব ব'লে আসবেন, তারপরে এসে যাকে খুশী তাকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাবেন। বলি, একি মগের মুল্লুক?

বিজু বিশেষ চমকাইয়া গেল দিদির সাহস দেখিয়া। দিদির গায়ে তাহার অপেক্ষা শক্তি বেশী থাকিতে পারে হয় তো, কিন্তু মেয়েমানুষের গায়ের শক্তি প্রয়োগ করার মধ্যে এতবিধ বাধা আছে যে তাহাদের সে শক্তি কোন কাজেই প্রায় আসেনা। এ সত্য বিজু ভাল করিয়াই জানিত। কাজেই দিদির সাহস দেখিয়া তাহার চমকাইবারই কথা।

তারপরেই বিজু দিদির চুলের আগা মুঠি করিয়া ধরিয়া তাহার পিঠে ঘাড়ে যথেচ্ছা কিল চাপড় বসাইতে শুরু করিয়া দিল। মানি তখন মহা মুস্কিলে পড়িয়া গিয়া কোনক্রমে কাপড়টাকে একবার সংযত করিয়া লইয়া বিজুকে একটা ধাক্কা দিয়া তাহাকে ঘরের মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, উল্লুক, আর আসবি কখনও আমার

সঙ্গে লাগতে ? একি বোকা মালাকে পেয়েছিস যে যখন খুশী দু ঘা দিবি বসিয়ে ?

মালা বিজুর মুখ চোখের ভাব দেখিয়া বলিল, আঃ মানিদি ছাড়ো, ছাড়ো, বিজুদার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে গেল যে।

মালার কথায় সহসা বিজুর মনে বীরত্বের সঞ্চার হইল। সে ব্রস্তে তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়া দিদির মুখের যেখানে পারিল সেখানে খিমচি কাটিয়া রক্ত বাহির করিয়া ছাড়িয়া দিল। মানি তখন বিজুকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

বিজু তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, আর কখনও আসবি আমার সঙ্গে লাগতে ? বলিয়াই সে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

মানিও তখন হাঁপাইতেছিল। সে একটু দম লইয়া মালাকে বলিল, দিন দিন ওটা এমন ষণ্ডা হয়ে উঠছে। মার আদর পেয়ে পেয়েই ওটা একেবারে গোল্লায় গেল !

মালা এই ব্যাপারে এতদূর ব্যথিত ও বিমাহত হইয়াছিল যে, তাহার মুখ দিয়া আর একটি কথাও বাহির হইতেছিল না। কিন্তু কথা না বলিলেও যে আর তাহার লজ্জার অবধি থাকে না। সে তাড়াতাড়ি মানির গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল, বাবা, বাবা, বিজুদা কত বড় মিথ্যুক ! একটা কথাও এর সত্যি নয় মানি দি।

সে আমি বুঝেছি। বলিয়া মানি আবার বলিল, একদিন এমন মার ওর কপালে লেখা আছে আমার হাতে, সেদিন ও বুঝবে যে মানি বড় কম মেয়ে নয়। দশজনে আস্কারা দিয়ে দিয়েই না ওর মাথাটা একেবারে খেয়েচে।

এ কথার পরে সেদিন মালা আর বেশী কথা বলে নাই। এক সময়

কাহাকেও কিছু না বলিয়া না জানাইয়াই এই কেয়াবনের পথ ধরিয়া একা একা বাড়ি চলিয়া গিয়াছিল।

কেয়াবনের পথ ধরিয়া বিজু একা একাই স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল। আর সে ভাবিতেছিল। বহুদিন মালাদের বাড়ি যাওয়া হয় নাই। মালাদের লিচু গাছের লিচুগুলি এতদিনে হয়ত পাকিয়া গিয়াছে। সেগুলি এতদিনে হয়ত কাকে বাদুড়ে মিলিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছে। অথচ, সেদিন মালাকে যে কারণে সে চড় বসাইয়া দিয়াছে তাহা যদি মালাদের বাড়ির কাহারও কাছে ফাঁস হইয়া গিয়া থাকে তো সেখানে সে যাইবে কেমন করিয়া? আর কি, ফাঁস এতদিনে না হইয়াছে? মালাকে সে তো কতদিন কত কথাই বলিয়াছে, কিন্তু সে সবের খোঁজ কেহ রাখিল না, আর ভুলে যাহা সে একদিন ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল তাহারই যত খোঁজ রাখিতে গেল। লোকের এই ন্যায়হীনতা অসহ্য একেবারে! অথচ, সেই সব লোকেদের কিছু না করিয়া মালাকে সে চড় মারিতেই বা গেল কেন? মালার তো কোন অপরাধ নাই। সেই সব লোকেদের যে তাহার করিবার কিছু ছিলও না। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহা গিয়াছে, সে জন্য আপশোষ করিয়া আর লাভ নাই। কোন মতেই তা বলিয়া মালাদের বাড়ির অমন লিচুর মায়া পরিত্যাগ করা চলে না। আজ সে বাড়ি ফিরিয়া বই পত্তর রাখিয়া সমস্ত মান-অপমান যশ-অপযশ ভুলিয়া একবার মালাদের বাড়ি যাইবেই যাইবে। তারপর বরাতে যাহা আছে তাহা সে অকাতরে সহ্য করিবে।

সমস্তই যখন ঠিক তখন কেয়াবনে কি যেন খস্ খস্ করিয়া উঠিল। বিজু চিন্তামগ্ন ছিল, কাজেই অধিকতর চম্‌কাইয়া একলাফে খানিকটা পথ আগাইয়া যাইতে গিয়া একেবারে হাস্নোচ্ছুল মালার গায়ের উপর

আসিয়া পড়িল। মালা পূর্ব্ব হইতেই চিন্তামগ্ন বিজুকে আসিতে দেখিয়াছিল, কিন্তু বিজু চিন্তামগ্ন ছিল বলিয়াই মালাকে দেখে নাই। উভয়ে উল্টা দিক হইতেই আসিতেছিল এবং এখানে পথও অনেকটা সোজা, কাজেই না দেখার আর কোন কারণ বর্ত্তমান নাই।

মালা হাসিয়া উঠিল, বলিল, বিজুদা এত বড়টি হ'লে এখনও তোমার ভয় কাটলো না? আর কাটবে কবে শুনি? একটা ব্যাঙ লাফালো তাতেই এই?

বিজু অপ্রতিভ হইয়াও অপ্রতিভ হয় নাই এমন ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল, ব্যাঙ নয়, ওটা একটা শঙ্খচূড় সাপ। অনেকক্ষণ ধ'রে এই পথের 'পরেই বসেছিল। ঢিল মারতে তবে সরে গেল। নইলে, ব্যাঙ দেখে লাফাবো আমি? স্কুল থেকে ফেরবার পথে প্রায়ই ওটাকে দেখি। ও কিন্তু কাউকে কোন দিন কিছু বলে না।

মালা বিজুর মিথ্যা সহজেই বুঝিয়া লইয়া বলিল, লোকের সঙ্গে ওর অত মিতালি কিসের বিজুদা? তোমার সঙ্গে ঠাট্টাও ওর চলে যে দেখচি!

—কি রকম?

আবার কি রকম! এই যেমন তুমি আমার সামনে একটু অপস্তুত হ'লে। আবার বানিয়ে তার জন্যে দুটো মিথ্যেও বললে।

বিজু মহা ক্ষেপিয়া গিয়া বলিল, আজকাল দিদির কাছে কি শিক্ষানবিশী হচ্চে নাকি তোররে মুখপুড়ি, দুদিন আগেও যার গালে চড় বসালে কাঁদতে পর্য্যন্ত সাহসে কুলোতো না তারও যে দেখি মুখ দিয়ে বড় কথা বেরোয়। দেব এক ধাক্কায় ঐ কেয়া কাঁটার ঝোঁপে পাঠিয়ে মুখপুড়ি।

মালা বিজুর কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, আজকাল তোমার কি হয়েচে শুনি বিজুদা যে, আমাদের বাড়ি একদিনও যেতে পারো না? অগত্যা বাধ্য হ'য়ে আজ গাছ থেকে লোক দিয়ে লিচু পাড়িয়ে নিজেই তোমাদের বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসতে হ'ল। মা বলেন,

আমার মুখ নাকি ভারি খারাপ তাতে যে কেউ রাগ করতে পারে, আর বিজুটা তো এমনিই অভিমানী ছেলে।···এদিকে মারও খেলাম, ওদিকে দোষও নিলাম। একথা বললে কি কেউ বিশ্বাস করবে যে, তুমি নিজের বোকামির লজ্জাতেই আর আমাদের বাড়ী যেতে পারো না?

বিজু তাড়াতাড়ি একটা ঢোক্ গিলিয়া লইয়া বলিল, ফের আবার ওকথা তুললেই দেব গালে তোর এমনি চড় বসিয়ে যে আর ভুলেও কখনও ওকথা তুলবি না।

মালা মিট্ করিয়া একটু দুষ্টের হাসি হাসিয়া লইয়া বলিল, কেমন ক'রে চড় বসাবে শুনি বিজুদা? মেয়েদের গা ছুঁতে তো তোমার আজকাল লজ্জা করে শুনি। দিদির হাত ধরতেই যার লজ্জা করে, সে কেমন ক'রে আবার পরের মেয়ের গা ছোঁবে শুনি? আর আমারও তো বয়স কিছু কম হয় নি।

বিজু লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেল। এ দুনিয়ায় কাহাকেও আর তবে বিশ্বাস করা চলে না। দিদিও এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারে। এখন যেখানে তাহারা দাঁড়াইয়া আছে তাহারই কাছাকাছি একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া যে-কথা সে এত একান্তে দিদির কাছে বলিয়াছে তাহাও মালার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর দুইদিন পরে হয় তো সকলেই একথা জানিবে। কি লজ্জার কথা!

বিজু অনেকটা বেপরোয়ার মত বলিয়া উঠিল, হুঁ, লজ্জা করে বইকি! শুধু লজ্জা নয়, এখন ঘেন্নাও বোধ হয়। একটা কথা যে জাতকে বিশ্বাস ক'রে বলা চলে না, সে জাতকে ছুঁতেও আমার ঘেন্না বোধ হয়।

মালা মহা কৌতুক অনুভব করিয়া বিজুর ক্রোধোত্তেজিত মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, তা ঘেন্না করতে হয় করগে, কিন্তু আজ কালের মধ্যেই আমাদের বাড়ি যেও, নইলে মার কাছে বকুনি খেয়ে খেয়ে জীবন আমার বেরিয়ে গেল। আচ্ছা যাব—বলিয়া বিজু মালার

একটা হাত ধরিয়া আবার বলিল, তার চেয়ে ফিরে চ, আমি বইগুলো বাড়িতে রেখেই তোর সঙ্গে তোদের বাড়ী যাব'খন।

মালা রাজি হইল। বিজু মালার হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, তোরা যে মিথ্যে কথা বলিস কেবল, দেখলি তো তোর গা ছুঁতে আমার একটুও লজ্জা করে না।

মালা মুখ টিপিয়া শুধু হাসিতে লাগিল, উত্তরে কিছুই বলিল না।

দুই তিনটা সম্বন্ধ ফিরিয়া যাওয়ার পরে একটা সম্বন্ধ এক রকম পাকাপাকিই হইয়া গেল। মানিকে দেখিয়া এ পর্য্যন্ত অপছন্দ কেহ করে নাই, তবে টাকা পয়সার বনিবনা হয় নাই বলিয়াই সে-সব সম্বন্ধ ফিরিয়া গেছে। যাহাদের সহিত কথা একরকম পাকাপাকি হইয়া গেল তাহাদের টাকা পয়সার দাবি এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। তাহারা পছন্দ-সই পাত্রী পাইলেই সন্তুষ্ট। সেদিকে মানির এক প্রকার ত্রুটি নাই বলাই ভাল। মানির রূপ শুধু যে পছন্দ করিবার মতই তাহা নয়, প্রশংসা করিবার মতও। তাহারা মানিকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিল। আর তদুপলক্ষে মালার মানিদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ছিল। সকালবেলা বিজু মালাকে তাহাদের বাড়িতে লইয়া আসিয়াছিল এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহাকে আবার বাড়ি পৌছাইয়া দিবার কথা ছিল।

বেলা দশটার মধ্যেই মানির আশীর্ব্বাদের কাজ শেষ হইয়া গেল। বারান্দায় আশীর্ব্বাদের কাজ হইয়াছিল। সেখান হইতে মুক্তি পাইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া মানি হাঁপ ছাড়িতেই মালা তাহার একটা হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, মস্ত ফাঁড়া কাটিয়ে উঠলে কিন্তু মানিদি। বাবা, তোমার মুখ চোখ এখনও যে লাল হ'য়ে আছে দেখচি।

বিজুও সেই ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া মালার মতই আশীর্ব্বাদের কাজ

দেখিতেছিল, আর বিপন্ন দিদির মুখের পানে চাহিয়া মনে মনে পরম কৌতুক অনুভব করিতেছিল। মালার কথা শুনিয়া সে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া বলিল, ইঃ, ভারি ত ফাঁড়া! হুঁ, হুঁ, আমাদের মত বছর বছর এগ্‌জামিন দিতে হ'ত তো বুঝতাম। তাকে বলে গিয়ে ফাঁড়া! এতো ভারি!

মানি তখনও চুপ করিয়াই ছিল। কারণ, তাহার ভাবী শ্বশুর-বাড়ির লোকেরা বারান্দা হইতে চলিয়া গেলেও বাড়ি হইতে যে যায় নাই, তাহা তাহার জানা ছিল। মালা মানির দিকে চাহিয়া বিজুর কথার উত্তর দিল, হুঁ, হ'তে মেয়েমানুষ তো বুঝতে ফাঁড়া কিনা!

বিজু বলিল, থাক্, আর আমার মেয়ে মানুষ হ'য়ে কাজ নেই। এক এগ্‌জামিনের ঠেলাই সামলাতে পারি না, তার আবার—। তারপরে দিদির দিকে ফিরিয়া বলিল, দিদি, তোর হাতে ওরা কি দিল রে?

মানি তাহার হাতের ছোট একটি ভেলভেটের খাপের মধ্যে রক্ষিত একজোড়া কানের দুল দেখাইয়া বলিল, কানের ফুলটুল হবে বোধ হয়।

মানি লজ্জায় তাহ' দেওয়ার সময় ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই। মালা হাত বাড়াইয়া তাহা মানির হাত হইতে লইয়া তাহার উপর চোখ বুলাইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার দুল দিয়েছ তো। দুর্গাপুরের রাঙাবৌদির ঠিক এই রকম একজোড়া দুল আছে।

বিজু বলিল, কিন্তু দিদির শ্বশুরবাড়ির লোকগুলো একটাও দেখতে ভাল না। ওরা আবার নাকি শহুরে লোক! ঠিক যেন দেখতে সব রায়েদের গোমস্তাগুলোর মত।

মানি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, তাতে তোর কিরে পোড়ারমুখো?

—না আমার আর কি? তোকে নিয়ে গিয়ে ওরা যখন তামাক সাজাবে তখন বুঝবি! বলিয়া বিজু আপন কৌতুকে হাসিতে লাগিল।

মালাও না হাসিয়া পারিল না। মানি রাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। মানিকে যাহারা আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিল তাহারা আহারাদির পর অপরাহ্ণেই বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। মালার কিন্তু যাই যাই করিয়া সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। তখন বিজু মানিকে বলিল, দিদি, ৮ দুজনে গিয়ে মালাকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে, ফিরবার পথে একা আমার ভয় করবে।

মানি বলিল, আমি তো যেতে পারবো না। তুই বরং অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে যা বিজু।

বিজু বলিল, কেন তুই পারবি না? সাপের ভয় তো তোর নেই।

মানি বলিল, সাপের ভয়ই কি দুনিয়ায় সব নাকি রে? সাপের চেয়ে ভীষণ জানোয়ার সব এ দুনিয়ায় আছে। আর তা ছাড়া মা আমাকে কিছুতেই যেতে দেবেন না।

অগত্যা বিজু পাশের বাড়ির একজনকে ডাকিয়া লইয়া লণ্ঠন ও লাঠি ঘাড়ে করিয়া মালাকে ঐ কেয়াবনের পথ দিয়াই তাহাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল।

ফেরার পথে বিজু ভাবিতেছিল, একদিন সে তাহার নির্ভীক দিদির সঙ্গে কত রাত্রেই না এ পথে মালাদের বাড়ি হইতে ফিরিয়াছে। আর আজ যেই দিদির সম্বন্ধ ঠিক হইয়া গেল অমনি যত রাজ্যের বাধা ভয় আসিয়া দিদির ঘাড়ে চাপিয়া বসিল। দুনিয়াটা এত তাড়াতাড়ি বদলাইয়া যাইতেছে কেন? আর একদিন মালাও হয় তো এ পথে চলিতে সাহস পাইবে না। কেন, তাহাদের এত ভয় কিসের? সাপ নয়, বাঘ নয়, জন্তু জানোয়ার নয়, তবে কি মানুষই তাহাদের ভয়ের কারণ? মানুষ মানুষকে ভয় পায়, এও তো বড় অদ্ভুত! শেষে সে ভাবিল, হয়ত একদিন বয়স হইলে তাহার কাছে ইহা আর অদ্ভুত লাগিবে না, সে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে না।

মানির বিবাহ হইয়া গেল। মানি ঐ কেয়াবনের পথ দিয়াই নিতান্ত অপরিচিত একটি ছেলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধিয়া একই পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেল। বিজু দেখিয়াছিল, দিদিকে চোখের জল ফেলিতে। এও অদ্ভুত! কোথাকার কে একজন, জানা নাই শুনা নাই, হঠাৎ আসিল, দিদিকে তাহার লইয়া কোথায় চলিয়া গেল কে জানে।

কে জানে কোথায়' রামপুরহাট। কিন্তু দিদি তাহার অত কম কাঁদিল কেন? সে হইলে তো চোখের জলে দুনিয়া ভাসাইয়া দিত। অথচ, সকলে সাদরে ঐ অপরিচিত ছেলেটির সঙ্গেই তো দিদিকে তাহার পাল্কীতে তুলিয়া দিল। কিন্তু সে যে-মালার এত পরিচিত, তবু সেই মালার গায়েও হাত ঠেকাইতে তাহার এত লজ্জা বোধ হয় কেন? লোকে দেখিলেও হয়ত তাহাকে মন্দ বলিবে। কি অদ্ভুত এই দুনিয়া! ভাবিয়া ইহার কূল-কিনারা করিয়া উঠা যায় না।

বিজু পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কেয়াবনের পথে খানিক দূর গিয়াছিল। তারপর দিদির ইঙ্গিতানুযায়ী সমস্ত ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়া আবার বাড়ির দিকেই ফিরিয়া আসিল।

মালা এ কয়দিন বিজুদের বাড়িতেই ছিল এবং মানির বিবাহের হল্লায় মাতিয়া ছিল। বিজু বাড়ি ফিরিতেই মালা বলিল, বিজুদা, আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে চল। মানিদি চ'লে গেল, মনটা আমার ভাল লাগচে না।

বিজু অকারণে রাগিয়া উঠিয়া বলিল, আমারই যেন খুব ভাল। চ' তবু এগিয়ে দিয়ে আসি, আর দু'দিন পরে তো আবার শ্বশুরবাড়ির পথেও এগিয়ে দিয়ে আসতে হবে। ছিল যত কর্ম্মভোগ—

মালা বিজুর কথা শুনিয়া আর হাসি সামলাইতে পারিল না বলিল, অত বুড়োমির কথা সব শিখলে কোত্থেকে বিজুদা ?

বিজু মালার কথার কোন উত্তর না দিয়া কেয়াবনের পথ ধরিয়া আগাইয়া চলিল, আর মালাও তাহার পিছু পিছু হাঁটিতে লাগিল।

খানিকটা পথ আসিয়া বিজু বলিল,—দিদির কি দুর্জ্জয় সাহস ছিল, এ-পথ দিয়ে রাত ক'রেও আলো ছাড়া যাতায়াত করতে পারত, সাপের নামে একটুও বুক কাঁপত না, আর এখন ? দিনের বেলায়ও যাবার সাহস হবে না। বিয়ে এমনই জিনিস !

মালা বলিল,—তা তোমার অত মাথাব্যথা কিসের বিজুদা ?

না, এমনিই বলছিলাম। আর দু'দিন পরে তোরও যে ঐ অবস্থা হবে কিনা, তাই।—বলিয়া বিজু থামিল।

মালা লজ্জায় আর কোন কথাই বলিল না।

বিজুর দিনদিন সাহস বাড়িতেছে। এখন কেয়াবনের পথ দিয়া চলিতে তাহার আর সাপের ভয় করে না। একটা আলো আর লাঠি হাতে থাকিলে রাত্রেও সে এপথ দিয়া যাতায়াত করিতে পারে। মালা আগে যেমন প্রায়ই তাহাদের বাড়ি আসিত, এখন আর তেমন আসে না, একা তো কোনদিনই আসে না। বলিলে বলে, মা ভারি রাগ করেন। বলেন, দিন দিন মেয়ের যত বয়স হ'চ্ছে তত বুদ্ধি কমচে।

বিজু শুনিয়া আর কিছু বলে না। মনে মনে ভাবে, সত্যই তো মানুষের দিন-দিন বয়স যত বাড়িতে থাকে, বুদ্ধিও ঠিক সেই পরিমাণে কমিতে থাকে।

কাজেই বাধ্য হইয়া মালাদের বাড়ি গিয়া মালার খোঁজ-খবর লইয়া আসিতে হয়, আবার দিদির কুশল সংবাদও তাহাকে জানাইয়া আসিতে

হয়। কিন্তু এই যাতায়াতও এখন তাহার আর ভাল লাগে না। কেননা, তাহার মনে হয়, দশজনে তাহাকে এখন আর পূর্ব্বের সেই সমাদর ও বিশ্বাসের চক্ষে দেখে না। শুধু তাহার মনে হয়, কেয়াবনের নির্জ্জন নিরালা পথ এখনও সেই পূর্ব্বের মতই তাহাকে সমাদরের চক্ষে দেখে, প্রয়োজন হইলে পূর্ব্বের মতই ভয় দেখায়, আবার পূর্ব্বের মত গন্ধ বিধুর করিয়াও তোলে। সেই শুধু এ জগতে আজিও বদ্‌লায় নাই।

আবার একদিন মালারও সম্বন্ধ আসিল, ফিরিয়াও গেল, আবার আসিল। একদিন শেষে পাকাপাকি হইয়া গেল, বিবাহের দিন স্থির হইল। মালাদের বাড়ি হইতে মানিকে আনার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু মানির শাশুড়ি জানাইয়াছিলেন যে, বধূমাতার সন্তান-সম্ভাবনা, কাজেই হল্লার মধ্যে তাহাকে না পাঠানই যুক্তিযুক্ত। মানি তাই আসিতে পারে নাই। মালার বিবাহোপলক্ষে বিজু দিনরাত খাটিয়া খাটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এতদূর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিবাহের রাত্রে নিমন্ত্রিতদের যখন সে পরিবেশন করিতেছিল তখন তাহার পা কাঁপিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতেছিল যে, আর বেশিক্ষণ হয়ত সে পরিবেশন করিতে পারিবে না। কার্য্যতও তাহাই হইল। নিমন্ত্রিতদের হাঁকডাকে তাড়াতাড়ি করিয়া পোলাওয়ের বাল্‌তি লইয়া উঠান পার হইতে গিয়া সে ধড়াস্ করিয়া পড়িয়া গেল। 'দেখ্, দেখ্' করিয়া লোকজন ছুটিয়া আসিল। ভিড় জমিয়া গেল। তেমন লাগে নাই সত্য, কিন্তু মাথাটা তাহার তখনও ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল। তাহাকে কয়েকজনে মিলিয়া একটা ঘরে তুলিয়া শোয়াইয়া দিয়া আবার তাহাদের নিজের নিজের কাজে চলিয়া গেল।

তখন আসিল মালা। মালা নববধূর বেশে সজ্জিতা, তাহাকে তখন অপরূপ দেখাইতেছে। মালার দিকে মুখ তুলিয়া বিজু চম্‌কাইয়া উঠিল।

মালাকে এ-বেশে যে এত অপরূপ দেখাইবে তাহা স্বপ্নেও কোন দিন সে ভাবিতে পারে নাই।

মালা তাহার কানের অতি কাছে মুখ লইয়া অতি আস্তে বলিল, খুব যা হোক্ কেলেঙ্কারী করলে বটে বিজুদা। এ আর কোনদিন আমি ভুলতে পারবো না, মানিদিকে লিখে সব জানিয়ে দেব তোমার কীর্ত্তি। কিন্তু বেশী লাগেনি তো কোথাও ?

বিজু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না।

মালা মনে মনে হাসিল।

রাত্রে না খাইয়াই বিজু কেয়াবনের পথ ধরিয়া বাড়ি ফিরিয়া চলিল। খাওয়ার স্পৃহা তাহার ছিল না, লোকে তাহা বিশ্বাস করে নাই, মালা করিয়াছিল। রাত তখন অনেক আলো তাহার সঙ্গে দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সে সঙ্গে আনে নাই। কেয়াবনের পথে চলিতে এখন আর তাহার ভয় করে না। সে-সব দিন এখন অতীত হইয়া গেছে। হউক কেয়াবনের পথ মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ, হউক রূপকথার নাগ-কন্যার দেশের মতই সর্পসঙ্কুল, তথাপি সে আর ভয় পায় না।

কিন্তু মাঝপথে আসিয়া তাহাকে একবার দাঁড়াইতে হইল। তারপর কি যেন ভাবিল, তারপর ভাবাকুল কণ্ঠে কেয়াবনের পথকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া উঠিল, এখন ?···একমাত্র আমারই এই কেয়াবনের পথ দিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে একা চলার অধিকার কায়েমী হ'য়ে রইল। সেখানে আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী! দিদি বহুদিন পূর্ব্বে সে অধিকার হারিয়েচে, মালাও আজ হারালো। এ-পথ একা আমার ; দিদিরও না, মালারও না।

নির্জ্জন কেয়াবনের পথ সহসা তন্দ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া শুনিল, কে একটা উন্মাদ যেন দর্প করিয়া তাহার অন্তরের রিক্ততা ব্যক্ত করিতেছে। ব্যথায় তাই বনপথের প্রাণও কাঁপিল।

বিজু আবার হাঁটিয়া চলিল·····একা।

অদ্য শেষ রজনী

ছোট শহর। আগম ও নির্গমের পথ তেমনই ছোট একটি স্টেশন। এই স্টেশনের গা বাহিয়া রাস্তা এবং সে রাস্তাই সে শহরের একমাত্র সম্বল, তাহাও আবার দু'মাইলের অধিক পথ আর অতিক্রম করিতে পারে নাই—একটি ছোট পাহাড়ের গায়ে গিয়া হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িয়া থামিয়াছে। শহর যেমন ছোট—সোরগোল তেমন কম। তবে পূজার কয়টা দিন জমিদার বাড়িতে যাত্রা থিয়েটার হয় বলিয়া কিছু···নচেৎ মৃতপ্রাণ বলিলে কিছু অন্যায় হইত না।

শহরের সেই প্রাণহীনতার কথাই হইতেছিল। রমেশ বলিল, কি আছে ছাই এখানে? না আছে একটা সিনেমা, না একটা থিয়েটার, এমন কি একটা ক্যানেস্তারা পিটিয়ে সার্কাস পার্টিও যদি কেউ খুলত। দিন যে এখানে কি ভাবে কাটাই, সে আমি জানি, আর জানে আমার···

সীতানাথ খুব উদ্‌গ্রীব হইয়া রমেশের কথাগুলি শুনিতেছিল, কিন্তু তাহাকে আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল,—থাকবে কি ছাই শুনি? লোক আছে শহরে যে, কিছু থাকবে? এই দেখ না খুললাম একটা চায়ের দোকান, তা—পয়সা দিয়ে খেতে আসার লোক ত দূরের কথা—বিনি পয়সার খদ্দেরও যদি দু একজন জুটল! আগে যাদের দেখা সাক্ষাৎ তবু এক-আধ দিন মিলত—দোকান খুলেই তাও খুইয়েছি। এমনি যা-দশা এই শহরের লোকদের—তা সব ফুর্ত্তি আমোদ থাকবে কি ক'রে শুনি?

সীতানাথের পাশে দাঁড়াইয়া গুরুদাস এতক্ষণ একটা মূল্যবান কথা বলিবার যোগ্য অবস্থার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল, সে সুযোগ তাহার

জুটিয়া যাওয়াতেই একটু আগ্রহাতিশয্যে সীতানাথের একটা হাত খপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তা যা-ই বল' সীতানাথ, তোমার চায়ের দোকান যে উঠে গেল তাতে আমি খুশিই হয়েছি! বাবা, চায়ের দোকান চললে আর রক্ষে ছিল কারও ; চায়ের দোকানগুলোই হ'ল যত সব রোগের ডিপো। শহরের একটা লোকও তাহলে বাঁচত আর ?

সীতানাথ ভ্রূকুটি করিয়া অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণকণ্ঠে বলিল, না, এখন চায়ের দোকান চলছে না, কিন্তু লোক তা ব'লে কি আর মরছে ?

রমেশ আড়ালে একটু হাসিয়া বলিল, আহা-হা সীতানাথ তুমি যে ভুল করছ, লোকে আর মরবে না কেন—মরবেই ত—তবু যদি তারা আমাদের গুরুদাস ডাক্তারকে একটা 'কল' দিয়ে মরে সে বুদ্ধি যদি তাদের থাকে।

ক্রমে শহরের দীনতার আলোচনা ডিঙাইয়া স্ব স্ব দীনতা লইয়া আলোচনা শুরু হইয়া গেল। গুরুদাস ঘা খাইয়া থামিল। সীতানাথ তখন একাই অনেক কথা বলিয়া চলিল। রমেশ মাঝে মাঝে সীতানাথের দম লওয়ার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা কথা যোগ করিয়া দিয়া তাহার উদ্যম ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া দিতেছিল। এমন সময় '—' জীবন বীমা অফিসের পাকা দালাল কামাখ্যা বগলে একরাশ কাগজ পত্র লইয়া বেশ একটু ভাবুকের মত সেখানে প্রবেশ করিয়া একটু অকারণে কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, কি—কি—কিহে···সেই আদ্দেক ছাগল আর আদ্দেক মানুষের কথাই চলছে বুঝি ? কিন্তু আমি ও-সব একেবারেই বিশ্বাস করি না। চাঁদ এসেছে আমাদের কাছে ধাপ্পাবাজি দেখাতে। বলি, এ আর কেউ না · এই আজ দশ বছর ধ'রে—লাইফ ইন্‌সিওরেন্স অফিসের এজেণ্টগিরি ক'রে খেয়ে আছি। আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজি! খবরদার, কেউ যদি ভুলেও তোমরা ও মুখো হও, এ আমি ব'লে দিলাম—ব্যাটার সব ফাঁকি আর ফিকির! আরে বাবা, আদ্দেক ছাগল আর আদ্দেক মানুষ

কখনও জন্মায় ? ওসব ভাঁওতা চলে পাড়াগেঁয়ে ভূতেদের কাছে, কিন্তু আমরা·····আরে থ্যা থ্যা, 'রাম বল'। কি বল' ভায়ারা, যাবে নাকি সব দেখতে ?

কামাখ্যা এতক্ষণ নিজের মনে কি সব বকিয়া যাইতেছিল তাহার এক বর্ণও কেহ বুঝিতে পারিতেছিল না ; তবে একথা নিঃসন্দেহে সকলেই বুঝিয়াছিল যে, কামাখ্যা একটা অবিশ্বাস্য অসম্ভব কোন কিছুর অবতারণা করিতে চাহে। কিন্তু কামাখ্যা নিজের বক্তব্য যখন স্পষ্ট না করিয়া সকলকে সংশয়ের মধ্যে রাখিয়া হঠাৎ সকলকে এক প্রশ্নে বিশেষ রকম বিচলিত করিয়া থামিল, তখন রমেশ সংশয় ঘুচাইবার জন্য সাহস সঞ্চয় করিয়া লইয়া আর সকলের মানসিক চাঞ্চল্য অপসারিত করিয়া বলিল, কি দেখতে ? তোমাদের বীমা অফিসের বড় সাহেবকে ?

কামাখ্যা ভারি খুশি হইল। বীমা অফিসের বড়সাহেবের প্রতি কামাখ্যার কেমন যেন একটা আক্রোশের ভাব ছিল। কামাখ্যা স্বচক্ষে বড়সাহেবকে কোন দিন দেখে নাই সত্য, কিন্তু না দেখিয়া কামাখ্যা দশ-জনের মুখে শুনিয়া সাহেবের মনগড়া একটা মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছিল এবং মনে মনে তাহার অমঙ্গল কামনা যতটা সম্ভব তাহা সে করিয়াছিল। এই বিজাতীয় মনোভাবের কারণ কোন দিন কেহ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। তবে দশজনে মনে করে যে, কামাখ্যা তাহার বীমা অফিসে একটি বড় দরের কর্ম্মচারীর পদপূরণ মানসে যে দরখাস্ত করিয়া-ছিল তাহা নাকি নামঞ্জুর হইয়াছিল, এবং তাহা মঞ্জুরের ভার নাকি ছিল বড় সাহেবের উপরই। তাহা অবশ্য হইলেও হইতে পারে।

কামাখ্যা খুব দমক্ দিয়া বার কতক হাসিয়া লইয়া বলিল, তা যা বলেছ, সে ব্যাটাও কিন্তু এক তাজ্জব জীব ! তা আধা ছাগল, আর আধা মানুষ বললেই হয়। কিন্তু সে সব নয়। শোন নি ? কেন, বাজারের পথ কেউ আজ মাড়াওনি বুঝি ? ক'ল্‌কাতা থেকে কে যে একটা লোক এসেছে চার আনা

ক'রে টিকিট, খুব ঢাক ঢোল পিটে খুব ত হ্যাণ্ডবিল ছড়াচ্ছে। ডাকঘরের পাশের যে মাঠ—সেই মাঠেই ত তাঁবু পড়বে শুনলাম। কিন্তু কি দেখাবে শুন্‌লেই সব চম্‌কে উঠবে। উঃ, ব্যাটার কি ধাপ্পাবাজি দেখ' একবার! একটা মরা মানুষ আর একটা মরা ছাগল কেটে সেলাই ক'রে নিয়ে এম্‌নি বোকা বানানো মানুষকে! ধ'রে পুলিশে দেওয়া উচিত।

সীতানাথ অকারণে হাততালি দিয়া উঠিয়া বলিল, বল' কি?

গুরুদাস হঠাৎ মাথা চুলকাইয়া বলিল, আদ্দেক মানুষের আকার, আর বাকী আদ্দেক ছাগলের—বল' কি হে কামিখ্যে? এ যে য়্যাবসার্ড একেবারে!

কামাখ্যা একটু ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, তবে ত খুব নতুন কথা শোনালে দেখছি, এতক্ষণে তবে আর বলছি কি?

তারপরে মানুষের বোকামি যে কোন স্তর পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তাহারই রীতিমত আলোচনা বহুক্ষণ ধরিয়া চালাইয়া সকলে মিলিয়া ঠিক করিল যে আগামী কল্য সকলে একত্র হইয়া ঐ কলিকালীন অদ্ভুত জীবটি চাক্ষুষ করিয়া আসিবে।

টিকিটের দামটা একটু বেশী। কিন্তু ঐ অপরূপ জীব দেখিয়া সে দুঃখ সকলেরই একরম ঘুচিয়া গিয়াছিল।

ডাকঘরের সীমা অতিক্রম করিয়া বাজারের কাছাকাছি আসিয়া রমেশ প্রথম কথা কহিল, বলিল, কিহে, কামিখ্যে, সন্দেহ এবার ঘুচল? আমি ত তখনই বলেছিলাম যে, হ'তেও পারে···এ পৃথিবীতে কত আশ্চর্য্য ঘটনাই ঘটছে রোজ। এই ত সেদিন কি একটা কাগজে যেন দেখছিলাম, আমেরিকায় না কোথায় যেন একটা জলজ্যান্ত মৎস্যনারী পাওয়া গেছে।

সীতানাথ এদিক ওদিক তাকাইয়া একটু দ্বিধাভরেই বলিল হুঁ, তা বটে, আমিও সে কাগজ পড়েছি রমেশ।

গুরুদাস বলিল, আমেরিকার কথা বলছ? আরে সেখানে হয় না কি শুনি?

মৎস্যনারী। ত ভারতবর্ষেও একদিন ছিল ব'লে শুনি, কিন্তু একটা গাছে একই বোঁটাতে ঝাঁকে ঝাঁকে আম জাম কাঁঠাল একসঙ্গে ফ'লে থাকতে শুনেছ কোথাও? আমি নিজে তার ছবি দেখেছি কাগজে। আদ্দেক ছাগল আর আদ্দেক মানুষ জন্মানো কিছু অসম্ভব নয়! আর তাছাড়া কত বড় বড় ডাক্তাররা পরীক্ষা ক'রে সার্টিফিকেট দিয়েছে তা দেখলে ত? আমার খুব বিশ্বাস হ'ল—তোমার কি এখনও সন্দেহ অছে না কি কামিখ্যে?

কামাখ্যা নিজের মনেই কি যেন ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিল, কাহারও কোন কথায় তাহার কান ছিল না। গুরুদাসের প্রশ্নে হঠাৎ সে চমকাইয়া উঠিয়া মাথায় হাত দিয়া বেদনাজড়িত কণ্ঠে বলিল, উঃ মাথাটা আজ ভারি ধ'রে গেল ত।

কামাখ্যার কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠস্বরে সকলেই একটু বিচলিত হইয়া তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। কামাখ্যা কিন্তু তাহাদের কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করিল না, সর্ব্বশেষে নিজের মনে মনেই যেন বলিল, উঃ কি ভিড়! এমন জানলে—

রমেশ তাড়াতাড়ি বলিল, সে কি কামিখ্যে, এমন জিনিস না দেখলে যে আফশোষের সীমা থাকত না।

সীতানাথ বলিল, সে কথা আর বলতে!

কামাখ্যা আর কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া আপনার মনেই পথ চলিতে লাগিল। বাজারের সীমা ততক্ষণে তাহারা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে।

অনিদ্রায় অতি জঘন্যভাবে রাত কাটাইয়া কামাখ্যা যখন শয্যা ত্যাগ করিল তখন বেলা অনেক হইয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর হইতে পকেট ঘড়িটা হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে দেখিল, আটটা বাজিয়া পঁয়ত্রিশ মিনিট

হইয়াছে। তারপরে ঘড়িতে চাবি দিয়া আবার ঘড়িটা যথাস্থানে রাখিয়া একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অন্যমনস্কভাবে কলতলার দিকে চলিয়া গেল। অকারণে কলতলায় কিছুক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কি উদ্দেশ্যে যে সে সেখানে আসিয়াছিল তাহা আর কিছুতেই যেন মনে করিতে পারিতেছিল না। সমস্তক্ষণ তাহার চোখের সম্মুখে কেবলই ঐ অপরূপ আকৃতির জীবটি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছিল। শুধু ঐ অপরূপ জীবের মূর্ত্তিই যদি তাহার চোখের সম্মুখে ভাসিত তাহা হইলে সে চেষ্টা করিয়া তাহা হয় ত বা ভুলিয়া থাকিতেও পারিত, কিন্তু ঐ অপরূপ জীবটির গর্ভধারিণীর পরিচয় দিয়া যে একটি নারীমূর্ত্তি পর্দ্দা সরাইয়া সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহাকে সে যে কিছুতেই আর ভুলিতে পারিতেছিল না। কামাখ্যা প্রথম এই স্ত্রীলোকটির মুখের পানে চাহিয়াই ভীষণ চমকাইয়া উঠিয়াছিল — কোন বিস্মৃত বীভৎস কাহিনী সহসা মানুষের মনে পড়িয়া গেলে মানুষ যেমনভাবে চমকাইয়া ওঠে ঠিক তেমনভাবেই।

কামাখ্যা ত্রস্তে চোখে-মুখে খানিক জল ছিটাইয়া দুঃস্বপ্ন কাটাইয়া উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিল। তারপরে অন্যান্য কাজের কথা ভুলিয়া আবার সেই বাজারের পথ ধরিয়া ডাকঘরের কাছের মাঠের তাঁবু ঘেরা স্থানটুকুর উদ্দেশ্যে হাঁটিয়া চলিল।

তাঁবুর কাছাকাছি আসিয়া মনটা তাহার কেমন সন্দেহযুক্ত হইয়া দোল খাইতে লাগিল। এমনও ত হইতে পারে যে, স্ত্রীলোকটিকে সে কাল ভুল দেখিয়াছে। আর সে যাহা ভাবিয়াছে তাহা যদি না-ই হয় তবে পরে তাহা কি যে বিশ্রী অবস্থায় তাহাকে ফেলিবে সেকথা মনে করিতেই তাহার দেহে ও মনে একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে আর যে কেহ ভুল করুক, সে যে ভুল করিতে পারে না—সে বিশ্বাস তাহার ছিল। না থাকিলে অবশ্য সে খুশি হইত।

তাঁবুর বাহিরের বড় বড় বাঁকা হরপের বিজ্ঞাপনটায় তাহার নজর পড়িতেই সে এক নিশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল।—

আসুন! দেখুন!
পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্য!
মানুষীর গর্ভজাত
অভিনব অর্দ্ধ-নর ও অর্দ্ধ-ছাগ আকৃতির জীব
প্রবেশ মূল্য—।০
দশম বর্ষীয় বালক-বালিকাদের ৵০
বিলম্বে হতাশ হইবেন।

কামাখ্যা হঠাৎ পিছাইয়া গেল।

—তুমি?—

প্রশ্ন করিয়াই স্ত্রীলোকটি একপ্রকার বীভৎস হাসি শুরু করিল। কামাখ্যা স্ত্রীলোকটির অপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া দৃষ্টি নামাইয়া এস্থান নিরুত্তরে অবিলম্বে ত্যাগ করা সমীচীন মনে করিল, কিন্তু পারিল না।

স্ত্রীলোকটি কামাখ্যার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কেন, আমাকে কি তুমি চিনতে পারছ না? আমি ত তোমাকে দেখেই চিনেছি। তারপরে এখানেই আজকাল থাকা হয় বুঝি? কেমন আছ? আবার কোথায় বিয়ে করলে শুনি?

কামাখ্যার বিচলিত ভাবটা অনেকটা কাটিয়া আসিলে সে বলিল, খুব চিনেছি, না চিন্‌লে এখানে আসার কোন প্রয়োজনই আমার হ'ত না। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে অত কথা বলতে চাইনে, ভেতরে জায়গা তেমন থাকে ত তোমার কথাও কিছু শুনে যেতাম। তুমি আজ অপরূপ একটি জীবের মা—তোমার সম্বন্ধে কৌতূহল মানুষের হ'তেই পারে।

—তবে ভেতরেই এস—বলিয়া স্ত্রীলোকটি কামাখ্যাকে পথ দেখাইয়া পর্দ্দার আড়াল দেওয়া একটা ঘরের মধ্যে আনিয়া বসাইয়া বলিল, সত্যি, কোথায় বিয়ে করলৈ শুনি ?

কামাখ্যা সঙ্কুচিত হইয়া বসিয়া বলিল, বিয়ে আর করি নি। স্ত্রীলোকের ওপর তুমি ঘৃণা ধরিয়ে দিলে, কাউকে আর বিশ্বাস হ'ল না।

—সবাই যে আমার মত হবে তার কি কোন মানে আছে ?

—মানে না থাক, মানা কিছু নেই। আর হবে না যে তারই কি কোন নিশ্চয়তা আছে ?

—আচ্ছা, সে কথা এখন থাক্। কিন্তু বিয়ে করলেই পারতে। ক'ল্‌কাতা ছেড়ে এখানে চ'লে এলে কেন ? চেনা লোকের মাঝে আর থাকতে পারলে না বুঝি ? আমি তোমার মান-কান সব ডুবিয়ে এসেছি, না ?

কামাখ্যা চেষ্টা করিয়াও সে কথার কোন জবাব দিতে পারিল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কথাটা অন্যদিকে ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিল, একটা কথার জবাব দেবে পুতুল ? সত্যি ক'রে বলবে—ঐ অদ্ভুত জীবটি কি তোমার গর্ভজাত ?

পুতুল তাড়াতাড়ি মুখে কাপড় চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে হাসি থামাইয়া বলিল, ওর আদ্দেকটা সত্যি—সত্যিই আমার গর্ভজাত, আর বাকিটা সে ত বুঝতেই পার। কি দুর্বুদ্ধিতে তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম জানি না; কিন্তু পরে যা দুর্গতির একশেষ হ'ল, সে আর না-ই শুনলে, আজ-কাল ওরই কল্যাণে যা'হ'ক দিন চলছে। কিন্তু পুলিশকে দিয়ে খুব যে থাকে তা মনে ক'র না।···কিন্তু যাক সে কথা। তুমি আবার বিয়ে কর, সত্যি সুখী হবে! তোমাকে যে পাবে সেও সুখী হবে। বল বিয়ে করবে কের ?

কামাখ্যা তীব্র কঠিন একপ্রকার হাসিয়া উঠিয়া বলিল, না, বিয়ে আর করতে পারব না।

পুতুল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কামাখ্যার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এখানে আরও হপ্তাখানেক আছি। বল, রোজ একবার ক'রে আসবে এখানে ?

কামাখ্যা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, না, এখানে আর আসতে পারব না। তোমাকে এখানে কেউ চেনে না বটে, কিন্তু আমাকে সবাই চেনে, লোক জানাজানি হ'য়ে যাবে।

—আচ্ছা, এসে তবে আর কাজ নেই—বলিয়া পুতুল কামাখ্যার পায়ের কাছে উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া ঢিব করিয়া একটা প্রণাম করিয়া উঠিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন কামাখ্যা দেখিল, পুতুলের দুই ক্লিষ্ট গণ্ড বাহিয়া চোখের জল নামিয়াছে। ক্ষণিকের জন্য কামাখ্যা স্তম্ভিতের মত সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপরে পর্দা সরাইয়া ধীরে ধীরে সে-স্থান পরিত্যাগ করিল।

অতি দীর্ঘ রজনী অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করিয়া কামাখ্যা বরাবর গুরুদাসের হোমিও হলে গিয়া উঠিল। গুরুদাস সবেমাত্র হলের ভাঙা দরজার তালা খুলিয়া সেখানে প্রবেশ করিয়া টেবিলটাকে সযত্নে সাজাইবে—বহুকাল পরে সংকল্প করিয়াছিল, কিন্তু কামাখ্যার আগমনে সে সংকল্প তাহার আর টিকিল না। গুরুদাস তাহাতে ক্ষুণ্ণ হওয়া ত দূরের কথা বরং অনেক মেহনতের হাত হইতে যে পরিত্রাণ পাইল এবং এমন দুর্বুদ্ধি যে তাহার কেন হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া কামাখ্যাকে মনে মনে প্রশংসাই করিল। প্রকাশ্যে বলিল, এত ভোরে কি মনে ক'রে হে কামিখ্যে ? লাইফ-ইন্‌সিওর যে করব না, আর করবার ক্ষ্যামতাও আমার যে নেই—সে কি আজও তোমার জানতে বাকি আছে ?

কামাখ্যা বাঁ হাতে কপালটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, না, ইন্‌সিওরের

কাজে আসিনি, এসেছি একটা ওষুধ নিতে। এই আজ ক'দিন ধ'রে বড় ইন্‌স্তম্‌নিয়ায় কষ্ট পাচ্ছি। তারই একটা ওষুধ দিতে হবে।

বটে! বটে!—গুরুদাস আপনাকে কৃতার্থ মনে করিল। কামাখ্যার সঙ্গে গুরুদাসের বহুকালের পরিচয়, এমন কি, বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও কামাখ্যা কোন দিন—গুরুদাসের ডাক্তারী-বিদ্যায় যে তাহার কিছুমাত্র আস্থা আছে, এমন কোন প্রকার ভাবই প্রকাশ করে নাই, বরং অনাস্থাই প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। গুরুদাস তাই আনন্দাতিশয্যে হঠাৎ বলিয়া বসিল, এঁ্যা, ইন্‌স্তম্‌নিয়া? বাপ রে—ও যে নবাব বাদশাহের রোগ হে! ওটির আবার আমদানী হ'ল কোত্থেকে?

কামাখ্যা বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে কি হেকিমী ওষুধ লাগবে মনে ক'র?

—আরে, না, না, হোমিওপ্যাথিই হ'ল ও-রোগের মোক্ষম। আর তোমাকে ত কবেই বলেছি যে তোমার হোমিওপ্যাথির ধাঁজ, কেমন, বলি নি? এখন, কি থেকে, কেমন করে হ'ল··

কামাখ্যা গুরুদাসের কথায় ত্রস্তে বাধা দিয়া বলিল, অত-শত জানিনে। ইন্‌স্তম্‌নিয়া···ইন্‌স্তম্‌নিয়া···আজ দু'রাত ঘুম নেই চোখে। যা-খুশী ওষুধ দাও একটা।

গুরুদাস কামাখ্যার বিরক্তভাব দেখিয়াও তাহার বিশ্লেষণ প্রিয় মনকে চেষ্টা করিয়াও দাবাইয়া রাখিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, ইন্‌স্তম্‌নিয়া কেমন ক'রে বুঝলে?

কামাখ্যা ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, আবার কেমন ক'রে মানুষ বোঝে শুনি? সারারাত যদি আমার মত তোমাকে জেগে কাটাতে হ'ত তবেই বুঝতে আমি কেমন ক'রে বুঝলাম।

গুরুদাস হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল, ও, একেবারেই তাহলে চোখে ঘুম ছিল না? হঠাৎ এমন হওয়ার মানে?

কামাখ্যার এইবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক কণ্ঠে চীৎকার করিরা বলিয়া উঠিল, তিন পুরুষের হিসেব নিকেশ দিয়ে তবে ওষুধ নিতে হবে নাকি ? থাক্, তোমার ওষুধ দিয়ে কাজ নেই।

বলিয়া কামাখ্যা রীতিমত রাগ করিয়া গুরুদাসের হোমিও হল হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, সহসা রমেশ আসিয়া তাহাকে বাধা দিল, বলিল, কি হে, মেজাজ দেখিয়ে চলে যাওয়া হ'চ্ছে ব্যাপারখানা কি ?

গুরুদাসও আসিয়া কামাখ্যার একটা হাত ধরিল, বলিল, ওষুধ কি একটা যা তা দিলেই হ'ল কামিখ্যে ? আগে রোগ চিনতে হবে, তারপরে ত ওষুধ দেব। এ হ'ল হোমিওপ্যাথি চিকিচ্ছে, রোগ চেনাই হ'ল এর আসল। এই দেখ না, একটু গরিমসি করায় তোমার রোগের একটা মস্ত লক্ষণ জানা গেল, এখন একটুতেই তোমার রাগ হ'চ্ছে। এ ত তুমি আমাকে বল নি, আর জানতামই বা আমি কেমন করে ? এখন তোমার রোগের ওষুধ দেওয়াটা কত সহজ হ'ল যে আমার পক্ষে, তা তুমি কি বুঝবে ! ব'স এক ডোজেই রোগ তোমার আমি সারিয়ে দিচ্ছি। আজ রাত্তিরে যদি বেঘোরে নিদ্রে না যাও ত ডাক্তারী আমি ছেড়ে দেব কামিখ্যে।

কামাখ্যা আবার হলে উঠিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, এখন দয়া ক'রে তোমার সেই এক ডোজ ওষুধ দিয়ে আমাকে কৃতার্থ কর।

রমেশও উঠিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া বলিল, সে কি কামিখ্যে, তোমার আবার কি রোগ হ'ল যে গুরুদাসকে ওষুধ দিতে হবে ?

কামাখ্যা বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, ইন্‌স্থম্‌নিয়া—ঘুম হ'চ্ছে না রাত্তিরে। এখন ডাক্তার ধরেছি যখন গুরুদাস মৈত্রকে, তখন রাজ্যিশুদ্ধ লোক জানা জানি না হ'লে কি আর ওষুধ পাওয়া যাবে।

রমেশ মোলায়েম একটু হাসিয়া বলিল, কবে থেকে ? ঐ তাজ্জব জীব যেদিন দেখে এসেছ সেইদিন থেকে নাকি ?

কামাখ্যা অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করিয়া বলিল, রোগের জন্ম বিবরণ অত

আমার জানা নেই। চললাম গুরুদাস, আমার কাজ আছে বিশেষ, ওষুধ আপাততঃ ভেবে ঠিক ক'রে রাখ, আমি সুযোগ বুঝে এসে নিয়ে যাব'খন।

কামাখ্যা কাহারও নিষেধ না শুনিয়া সত্যই চলিয়া গেল।

রমেশ একটু বিব্রত হইয়া গুরুদাসের মুখের দিকে চাহিল। গুরুদাস আলমারি হইতে একটা শিশি বাছিয়া বাহির করিয়াছিল, কিন্তু কামাখ্যা চলিয়া যাওয়ায় আবার তাহা সে আলমারির মধ্যে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে বসিয়া বলিল, কামিখ্যের কি যেন হয়েছে রমেশ, ওর মেজাজ কোন দিনই এমন ছিল না।

রমেশ বলিল, তা কিছু যে হয়েছে সে ত হাবভাবেই বোঝা গেল। তবে যে কারণেই হ'ক রাত্তিরে মানুষের ঘুম না হ'লে মেজাজ এমনই বিগড়ে যায়। তা ওকে আর দোষ দেব কি!

কিন্তু উভয়ের অনেক গবেষণার ফলেও কামাখ্যার রোগের উৎপত্তি স্থান বা কারণ আবিষ্কৃত হইল না। তবে ইহা স্থিরীকৃত হইল যে, দুইরাত্রি কেন—একরাত্রি মানুষের অনিদ্রায় কাটিলেই কামাখ্যার ন্যায় মেজাজ হইতে কোন বাধা থাকে না। কাজেই কামাখ্যার মেজাজের জন্য অসন্তুষ্ট কেহ হইল না, বরং তাহার প্রতি তাহাদের করুণা দেখা দিল। আরও বিশেষ এই কারণে যে, কামাখ্যার অবিবাহিত জীবনে আত্মীয় স্বজনহীন হইয়া বিদেশে থাকাটা কতই না কষ্টের!

নিজের অবসর মত কামাখ্যা গুরুদাসের নিকট হইতে ঔষধ আনাইয়া পান করিয়াছিল, কিন্তু সে ঔষধে কোন ফল হয় নাই। পরের রাত্রিগুলিও তাহার পূর্ব্বের মত অনিদ্রায় ও অস্থিরতায় কাটিল। কোন ঔষধে যে তাহার রোগের প্রতিকার হইবে না—তাহা সে বুঝিয়াছিল; কাজেই গুরুদাসের

হোমিও হলে যাওয়াও সে বন্ধ করিয়াছিল। পুতুল প্রত্যহ একবার তাহাকে দেখা করিতে বলিয়াছিল, কিন্তু পাঁচ দিন অতি কষ্টে তাহার কাটিল, তবু সে একবারও ডাকঘরের পাশের তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে করিতে পারে নাই। অথচ, সেখানে যাওয়ার জন্য, অন্তত পুতুলের সঙ্গে আর একবার দেখা করার জন্য অন্তরে তাহার বিশেষ তাগিদ বর্ত্তমান ছিল। পুতুলের সব কথা তাহার শোনা হয় নাই, সেই পুতুলের অশ্রুত অধঃপতনের কাহিনী শোনার জন্য কেমন যেন অত্যুগ্র কৌতূহল তাহার মধ্যে বিরাজ করিতেছিল। কিন্তু নিজেকে পাছে লোক চক্ষুতে লাঞ্ছিত দেখিতে হয়, সেই ভয়েই সে নিজের অদম্য কৌতূহল কোন রকমে দাবাইয়া রাখিয়াছিল। এবং দাবাইয়া রাখিতে গিয়া মানসিক অস্থিরতায় সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। এ কয়দিন রাস্তায় সে নিতান্ত প্রয়োজনে ছাড়া বাহির হয় নাই। নিজ কাজের তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতি যে হইয়াছে—তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আজ আর সে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। বেলা একটু পড়িয়া আসিতেই বাজারের দিকে হাঁটিয়া চলিল। বাজারের কাছাকাছি আসিয়া কতকগুলি বেড়ার গায়ে এবং গাছের গায়ে বিজ্ঞাপন দেখিতে পাইল তাহাতে লেখা,—

অদ্য শেষ রজনী !

বাকী লেখাগুলি কামাখ্যা আর পড়িতে চেষ্টা করে নাই। মন তাহার কেমন করিয়া উঠিল। সত্যই, আজ যদি পুতুল দলবল সহ চলিয়া যায় ত জীবনে আর কখনও দেখা হইবে কি-না কে জানে। কিন্তু পুতুলের নিকট হইতে অনেক কিছু শুনিবার যেন তাহার আছে। কেন, কিসের মোহে যে পুতুল এই জঘন্য জীবন বরণ করিল তাহা ত পুতুলকে সে একবারও জিজ্ঞাসা করে নাই! পুতুল নীচ ঘরের কন্যা সন্দেহ নাই, তাহার জন্ম-

বৃত্তান্ত প্রশ্নযুক্ত, কিন্তু কামাখ্যা সে-সব তুচ্ছ করিয়াই ত পুতুলকে বিবাহ করিয়া তাহাকে পদমর্য্যাদা দিতে চাহিয়াছিল। পুতুল সে সব গ্রাহ্য করে নাই, অতীতের পঙ্কে আবার নিজেকে না নামাইয়া থাকিতে পারে নাই। এসবের জন্য পুতুলের মা যে বিশেষ ভাবে দায়ী তাহা কামাখ্যা ভাল করিয়াই জানিত, পুতুলের সে মা আজ কোথায়, তাহাও সেদিন কামাখ্যা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। কামাখ্যার নিকট হইতে কিছু অর্থ সাহায্য পাইয়া সে দিন পুতুলের মা পুতুলকে কামাখ্যার নিকট বিবাহ দেয় নাই ঠিক—বিক্রয় করিয়াছিল। কামাখ্যার কাছে সে-সব এখন জলের মত পরিষ্কার। কিন্তু পুতুলের সহিত কামাখ্যার শাস্ত্রমতে বিবাহও যে হইয়াছিল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। অন্তত, কামাখ্যা অস্বীকার করিতে পারিবে না কিছুতেই। পুতুলের অতীত জীবন ত জঘন্য ও হেয়, কিন্তু ইহারই মধ্যবর্ত্তী কালে সে একদিন কামাখ্যার বিবাহিত স্ত্রীরূপে দিনাতিপাত করিয়াছে—তাহা কামাখ্যা কিছুতেই ভুলিতে পারে না। এখন এই অভিনব অপরূপ জীবের গর্ভধারিণীরূপে যাহার পরিচয়—সেই পুতুল যে কামাখ্যার স্ত্রী ছিল একদিন সে-কথা আর কেহ না জানিলেও জানিতে পারে, কিন্তু কামাখ্যা তাহা কিছুতেই অস্বীকার করিয়া থাকিতে পারে না। স্ত্রীর এ জঘন্য মনোবৃত্তিতে কামাখ্যা মানসিক স্থৈর্য্য না হারাইয়া থাকিতে পারে নাই: পুতুলকে এ গভীর পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা যেন তাহার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া সে জ্ঞান করে। কিন্তু তাহা যে কতদূর অসম্ভব, তাহা কামাখ্যা ভাল করিয়াই জানে।

সমস্ত বৈকাল ও সন্ধ্যাটা পথে পথে কাটাইয়া রাত্রের অন্ধকারে কামাখ্যা তাঁবুর পিছনের পর্দ্দাটা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। রাত্রের শেষ 'শো' তাহারই সামান্য পূর্ব্বে শেষ হইয়াছে। পুতুল পিছনেই ঠিক দাঁড়াইয়া একটা জীর্ণ প্যাণ্ট ও হাফ-শার্ট পরা একটি লোকের সঙ্গে কি যেন কথা বলিতেছিল। কামাখ্যার আগমনে সে একটু চকিত হইয়া ইঙ্গিতে

লোকটিকে সহজে বিদায় করিয়া দিয়া কামাখ্যার একটা হাত ধরিয়া তাহাকে এক পাশে লইয়া গিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া নিজে তাহারই পায়ের কাছে মাটিতে বসিয়া বলিল, আমি ভাবলাম, তুমি আর আসবে না। অবশ্য, না এলে তোমাকে দোষ দেবার আমার কিছু ছিল না। তুমি ব'লেই হয় ত এসেছ, অন্য কেউ হ'লে নিশ্চয়ই আসত না।

কামাখ্যা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল, আজই কি এখানে তোমাদের শেষ রজনী ?

পুতুল মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন, বিজ্ঞাপন দেখলে বুঝি ?

—হু।

পুতুল আবার হাসিয়া বলিল, ওটা আমাদের ব্যবসার একটা চাল। এমনি দিন তিন ত চলবে 'শেষ-রজনী', তারপর তাঁবু গুটোব। তবে রবিবার পর্য্যন্ত এখানে আছি।

কামাখ্যা বলিল, আজ হ'ল বেস্পতিবার, তাহ'লে তিন দিন মাত্র এখানে মেয়াদ তোমাদের ?

পুতুল বলিল, হ্যাঁ। তুমি বুঝি 'শেষ-রজনী' ভেবেই ছুটে এসেছ ?

কামাখ্যা একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, ঠিক তা নয়, আজ এখানে আমি আসতামই। আর বাড়ি থেকে যখন বেরিয়েছি তখন তোমাদের বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই অবশ্য ছিল না, পথে বেরিয়েই তবে দেখলাম।

কিছুক্ষণ নীরবে পুতুলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কামাখ্যা আবার বলিল, সত্যি পুতুল, আমি তোমার দিকে চেয়ে অবাক হ'য়ে যাচ্ছি এই কথা ভেবে যে, তুমি একদিন আমার স্ত্রী ছিলে, আর আমরা দুজনে দুজনকে দুনিয়ার আর সবার চেয়ে ভালবাসতাম।

পুতুল মাটির দিকে দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, সে কথা তুমি যে কোন দিনই ভুলতে পারবে না, সে আমি জানি।

কামাখ্যা সহসা পুতুলের একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, তুমিই কি কোন দিন তা ভুলতে পারবে পুতুল ? আচ্ছা পুতুল, আমাদের সেদিন আর ফিরে আসে না ? চেষ্টা করলে আবার তুমি আমার স্ত্রী হ'তে পার না ?

পুতুল ততোধিক দৃষ্টি নত করিয়া বলিল, অসম্ভব, তুমি আর কখনও আমাকে স্ত্রী ব'লে কিছুতেই গ্রহণ করতে পার না।

কামাখ্যা বলিল, তা আমি খুব পারি পুতুল, তোমার জঘন্য জন্মবৃত্তান্ত ত আমার অজানা ছিল না, তবু আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে অনায়াসেই গ্রহণ করতে পেরেছিলাম ; আজও অনায়াসেই পারব ব'লে মনে করি।

—না, তা আর পারবে না। আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নই ব'লে হয়ত সেদিন আমাকে গ্রহণ করেছিলে, কিন্তু আমার আজকের অবস্থার জন্যে যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী, তা তুমি ক্ষমা করবে কেমন করে ?

কামাখ্যা বিশেষ উত্তেজিত হইয়া বলিল, আমার স্ত্রী যদি এমনই জঘন্য জীবন বরণ ক'রে নেয় ত তাই বা আমি সহ্য করব কেমন করে ? আজ ক'রাত্তিরে এই দুর্ভাবনায় আমি ঘুমুতে পর্য্যন্ত পারি নি পুতুল।

—এ ত আমি যে ক'দিন তোমার সামনে আছি সে ক'দিন। এখান থেকে আমি চ'লে গেলেই—এ দুর্ভাবনা তোমার কেটে যাবে। কিন্তু তোমার কথায় রাজি হ'লে যে চিরকাল তুমি আর ঘুমুতে পারবে না !

—তবু আমার সান্ত্বনা থাকবে যে, আমি আমার স্ত্রীকে আমরণ নরকে পচতে দি' নি।

—তা স্বীকার করছি, কিন্তু চিরকাল তোমার চোখের সামনে যে আমি নরকের সমস্ত জ্বালা নিয়ে বিরাজ করব—সে কি তুমি সহ্য করতে পারবে ?

—পুতুল তর্ক ক'রে এর মীমাংসা হ'তে পারে না। আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে আমাদের ক্ষতি কি ? তোমার ত এতে কোন লোকসান নেই, লোকসান যা—সে আমার।

পুতুল নির্দ্দোষ হাসিয়া বলিল, তোমার কথা শুনে সত্যিই বড় লোভ হ'চ্ছে, কিন্তু তোমাকে আর ঠকাতে প্রবৃত্তি হয় না। তুমি যে কত ভালবেসে-ছিলে আমাকে—সেই কথাই আমি আমরণ মনে ক'রে রাখব; আর পারি ত এ ঋণ পরজন্মে শোধ দেব, এ জন্মে আর আমাকে কোনও অনুরোধ ক'রে নজেকে ছোট ক'র না।

কামাখ্যা উঠিয়া দাঁড়াইল—বিদায় লইতে নয়, অসহ্য ব্যথায়, তারপরে পুতুলের একটা হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিয়া বলিল, পরজন্মে কেন পুতুল, এ জন্মে আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখায় আপত্তি কি তোমার?

—আপত্তি?—পুতুল কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, সে সম্ভব নয় ব'লেই আমার আপত্তি। তবে তুমি যদি—

কামাখ্যা বাধা দিয়া পুতুলকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, যদি নয় পুতুল, আমি একান্ত ক'রে আবার তোমাকে পেতে চাই। তোমার সমস্ত কলঙ্ক আমি মুছে দেব—আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে। তোমাকে বশে আনব, আর তা যদি না পারি ত আমার পৌরুষ রয়ে যাবে পরাজিত—চিরদিনের মত! সে গ্লানি আমি কিছুতেই বয়ে বেড়াতে পারব না।

পুতুল বলিল, আমার কাছে আজ সবই সমান, কাজেই তোমাকে আরও গভীর ক'রে সব দিক ভেবে দেখতে বলি। তুমি যদি সত্যিই আবার আমাকে চাও ত আমার দিক থেকে কোন বাধা উঠবে না জেন। বাধা যদি আমি দিই, তা দেব তোমার কারণেই। আমি জীবনের জঘন্যতার চরম দেখেছি, কাজেই আমার কোনোকিছুতেই ভয় পাবার নেই।

—আর ভাববার কিছু নেই পুতুল; তুমি মত দিলে পর আমি নতুন ক'রে আবার ভাবব, তার আগে নয়।

পুতুল কামাখ্যার একটা হাত আনন্দে অন্তরঙ্গতার সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, অনেক অপরাধে অপরাধী, আর অপরাধ আমার বাড়িও না। তোমার ওপরেই ছেড়ে দিলাম, তুমি যা বলবে তাতেই আমি রাজি।

কামাখ্যার উন্মুক্ত হাতখানি পুতুলের স্কন্ধদেশের রাশিকৃত চুলের মধ্যে আশ্রয় লইল। কামাখ্যার মুখ দিয়া আর একটা কথাও বাহির হইল না। পুতুলের চোখে কেন জানি জল আসিয়া পড়িল। পুতুলের নারীত্ব হয় ত তখনও বিদায় অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া যায় নাই।

পুতুল কথা রাখিয়াছে। রাত বারটার সময় পশ্চিমে যাওয়ার একখানি ট্রেন আসিয়া ছোট একটা স্টেশনে দাঁড়ায় এবং অতি অল্প সময়ের জন্যই দাঁড়ায়। কামাখ্যার কথামত রবিবার রাত্রের সেই ট্রেন ধরিবার জন্য পুতুল যথাকালে স্টেশনে আসিয়াছে, কামাখ্যাও কোনরূপ ত্রুটি করে নাই।

উভয়ে একটা তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া পাশাপাশি বসিলে ট্রেন ছাড়িয়া দিল। গাড়ীতে ভিড় বেশী ছিল না এবং সামান্য যে ভিড় তাহাও পশ্চিমা লোকদের, বাঙালী একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে। কামাখ্যা সে কারণে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

পুতুল ঠিক হইয়া বসিয়া বলিল, আজ সত্যিই আমাদের 'শেষ রজনী'। এতক্ষণে তাঁবু বোধ হয় গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, কাল ভোরেই সব রওনা হবে। না-জানি এতক্ষণ আমার জন্যে খোঁজাখুঁজি প'ড়ে গেছে। ওরা কেউ ভাবতেই পারে নি যে, আমি এমন কারও সঙ্গে আবার পালিয়ে যেতে পারি। সত্যি, এ বড় অদ্ভুত লাগছে!

কামাখ্যা তাড়াতাড়ি বলিল, আঃ, আস্তে কথা কও পুতুল। তুমি আবার আমাকে বিপদে না ফেল।

পুতুল এইবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বিপদ আবার কিসের? যাত্রীরা সব বেঘোরে ঘুমুচ্ছে আর তা' ছাড়াও তোমার বিপদ হবে কেন শুনি? তুমি ত অপরের স্ত্রী নিয়ে পালাচ্ছ না, নিজের বিয়ে করা স্ত্রীকে

নিয়েই ত—হুঁ, পাল্লাচ্ছ যে তা ঠিক। এতে বিপদের কোন সম্ভাবনা ত আমি দেখছি না।

কামাখ্যা বিব্রত হইয়া বলিল, কিন্তু ঠিক নিজের স্ত্রীর মতও যে আমি ভাবতে পারছি না! যাই হোক্, এ নিয়ে তোমার আর হল্লা ক'রে কাজ নেই।

পুতুল মৃদু হাসিয়া বলিল, তুমি সত্যি হাসালে আমাকে। আমি অবাক হ'য়ে ভাবছি, তুমি সত্যিই কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছ?

কামাখ্যা সহসা চিন্তান্বিত হইয়া বলিল, আমিও ঠিক সেই কথাই ভাবচি পুতুল! মানুষ পারে ব'লে আমার ধারণায় আসে না, কিন্তু আমি ত তোমাকে অনায়াসেই ক্ষমা করতে পেরেছি।

পুতুল কামাখ্যার আরও কাছে ঘেসিয়া আস্তে করিয়া বলিল, সত্যি, তুমি যে কত বড়—আমি সেকথা ভেবেই অবাক হ'য়ে যাচ্ছি। দুনিয়ায় একাজ আর কারও দ্বারা সম্ভব হ'ত ব'লে আমি মনে করি না। অথচ এই তোমাকেই একদিন আমি চিনিনি।

পুতুল কামাখ্যার বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া যেন সান্ত্বনা খুঁজিল। কামাখ্যা পুতুলের হাত লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, তোমার স্বভাব কিন্তু আজও ঠিক তেমনই আছে পুতুল। একটু বয়স হয়েছে ব'লে মনে হয়, নইলে সবই প্রায় তোমার সেই আগেকার মতই আছে, এমন কি, কথা বলার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত ভুল হয় নি।

—আর তুমি?

পুতুল কি যে বলিবে ঠিক ভাবিয়া পাইতেছিল না। কাজেই বলিল, তোমার স্বভাব আরও ভাল হয়েছে। তোমাকে পেয়ে আমি সত্যি সুখী হব।

কামাখ্যা তাড়াতাড়ি পুতুলকে তুলিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, আঃ পুতুল,

তুমি কেবলই ভুলে যাচ্ছ যে, আমরা ট্রেনের যাত্রী, আরও সব যাত্রী পাশে ব'সে আছে।

মধ্যরাত্রের তিমির অবগুণ্ঠন অবজ্ঞাভরে উন্মোচিত করিয়া দিয়া পশ্চিম-যাত্রী দানবাকার ট্রেনখানি সর্পিল গতিতে সগর্জ্জনে ছুটিয়া চলিয়াছিল। যাত্রীদল তন্দ্রাভিভূত,—শুধু কামাখ্যা আর পুতুলের চোখে আজ তন্দ্রার অভাব, তাহারা যেন নূতন করিয়া আজ আবার ট্রেনের কামরায় বসিয়া বাসররাত্রি জাগিতেছে।

ট্রেন যখন সোন ঈষ্ট ব্যাঙ্ক স্টেশনে আসিয়া থামিল তখন পুতুলের চমক্ ভাঙিল। রাত্রি তখন প্রায় দুইটা, বাহিরে ঠাণ্ডা হাওয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে, কিছু পূর্ব্বে যেন এদিকে একটু বৃষ্টি হইয়া গেছে, পুতুল কামাখ্যার হাত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, বড় তেষ্টা পেয়েছে আমার, একটু খাবার জল জোগাড় হয় না এখানে? একবার নেমে দেখবে লক্ষ্মীটি?

কামাখ্যা ট্রেনের দরজা খুলিয়া জলের সন্ধানে নামিয়া পড়িল এবং নামার সঙ্গে সঙ্গে কামরাটি ভাল করিয়া চিনিয়া লইল। প্ল্যাটফর্ম্মে নামিয়া দাঁড়াইতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন লুটাইয়া পড়িল। এতরাত্রে বিদেশে অপরিচিত একটি স্টেশনের আবহাওয়া তাহার বেশ লাগিতেছিল। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া যাওয়ায় আরও চমৎকার লাগিতেছিল। আকাশ তখনও মেঘাচ্ছন্ন—বহুদূর শূন্যে বিদ্যুৎ ঝল্‌কাইয়া আশু বর্ষণের সূচনা জানাইতেছিল।

কামাখ্যা অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া জলের কল আবিষ্কার করিল, কিন্তু পাত্র আর সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। স্টেশনে জাগ্রতের সংখ্যা তখন অতি বিরল, কাহারও সাহায্য পাওয়া তখন আশাতিরিক্ত। কামাখ্যা কোনক্রমেই আর পাত্র সংগ্রহ করিতে পারিল না। ট্রেন ছাড়িতে বিলম্ব আছে জানিয়াও সে হতাশ হইয়া পড়িল; আবার শূন্য হাতে ফিরিয়া যাইবে কি না, তাহাই সে ভাবিতেছিল।

জলের কল ছাড়াইয়া ওভার ব্রীজ ছাড়াইয়া দূরে একটা চায়ের দোকান দেখা যাইতেছে যেন! কামাখ্যা একবার শেষ চেষ্টার জন্য চায়ের দোকান লক্ষ্য করিয়াই চলিল, যদি একটা ভাঁড় সে পয়সা দিয়াও সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু ওভার ব্রীজের কাছে আসিতেই সহসা তাহার কেমন যেন মনে হইল, ট্রেন যদি এখন ছাড়িয়া দেয়! ছাড়িয়া দিলে পুতুল মনে করিবে কি!

কামাখ্যা কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে ওভার ব্রীজের একদিকের রেলিং চাপিয়া ধরিয়াই রহিল, সত্যই ত এ সে করিতেছে কি! পুতুলের সঙ্গে আর কি কখনও তাহার জীবন খাপ খাইতে পারে? অসম্ভব! পুতুল কিছুতেই তাহার অতীত ভুলিতে পারিবে না, আর সে নিজেই কি পুতুলের ঐ জঘন্যতম জীবন ভুলিয়া থাকিতে পারিবে? পুতুলের সারাদেহ আজ মলিন পঙ্কবিলিপ্ত সেখানে সে আর কি চন্দন সুরভি সৃজন করিতে পারিবে? এত সহজ দিকটা যে কোন অতলে তলাইয়া গিয়াছিল তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না। পুতুলকে লইয়া লোকসমাজে সসম্মানে আর বাঁচিয়া থাকা চলে না, আর নিজেকে প্রবঞ্চনার দ্বারা পুতুলকে পাওয়া যাইতে পারে হয়ত, কিন্তু সে পাওয়া কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। পুতুল সে কথা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিল, কিন্তু সে যে কেন বোঝে নাই তাহাই এ মুহূর্ত্তে তাহার কাছে পরম বিস্ময় বলিয়া মনে হইতেছিল।

কিন্তু এভাবে কাপুরুষের মত বিদায় লওয়া—কামাখ্যার সমস্ত হৃদয় মন ধিক্কার দিয়া উঠিতেছিল। পুতুলকে এভাবে বঞ্চনা করার অধিকার তাহার কোথায়? পুতুল তাহাকে অনায়াসেই বিশ্বাস করিতে পারিয়াছে, আর সে এভাবে তাহার বিশ্বাসভঙ্গ করিবে! এই কি তবে তাহার প্রতিশোধ প্রবৃত্তি! পুতুল হয় ত তাহাই ভাবিবে, কিন্তু পুতুল যাহাই ভাবুক, পুতুলের ভাবনায় তাহার কিছুই যায় আসে না। পুতুল তাহাকে কাপুরুষ, ভীরু, অমানুষ সব কিছুই ভাবিতে পারে, কিন্তু পুতুলের সঙ্গে কিছুতেই

আর তাহার জীবনের যোগ সাধিত হইতে পারে না। এ ত সহজ সত্য—এত বিলম্বে যে কেন তাহার চোখে ধরা পড়িল তাহাই সে ভাবিয়া পাইতেছিল না।

হ্যাঁ, ইহাকে যদি প্রতিশোধ বলিয়া কেহ মনে করে ত কামাখ্যা প্রতিশোধ লইতেই ওভার-ব্রীজের রেলিংটা সবলে চাপিয়া ধরিল। কামাখ্যা আর কিছুই তখন ভাবিতে পারিতেছিল না।

ট্রেন চলিতে শুরু করিল।

কামাখ্যা সভয়ে ওভার ব্রীজের সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উপরে উঠিয়া দাঁড়াইল। ট্রেন ধীর মন্থর গতিতে ব্রীজ ছাড়াইয়া গেল, তারপরে দূরে—

—বহুদূরে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। কামাখ্যা একটা সুগভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ব্রীজের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উঠিয়া দাঁড়াইল। কানে তাহার আসিয়া তখন বাজিতেছিল যেন, একটা নিরুদ্ধ ক্রন্দন, একটা ক্ষীণ অভিশাপ, একটা অস্পষ্ট আব্দার—একটু জল।

প্রায় জানা ছিল

ভাঙ্গন-মুখর পদ্মার তীরে ছোট একটি গ্রাম। সম্বলের মধ্যে তাহার বাজার, আর স্টীমার স্টেশন। তবে গ্রাম বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বাজার ও স্টেশন হইতে একটু দূরেই। কিন্তু হইলে কি হয়—স্টেশনটিই গ্রামের বহির্বাটি, বাজারটি বৈঠকখানা আর অন্দরের মাঝামাঝি।

সমস্ত দিনে চারিখানি স্টীমার স্টেশনের ফ্ল্যাটে আসিয়া লাগে, আবার বিদায়ের করুণ বাঁশী বাজাইয়া দূরে চলিয়া যায়। গ্রামের বুকে তাহারই স্পন্দন জাগে—কোনদিন হয়ত গ্রামে নূতন অতিথি আসে, কোনদিন আবার আসেও না,—যাহারা আসে তাহারা হয়ত' দূর গ্রামে চলিয়া যায়। গ্রামের বুকে এই যাতায়াতের সামান্য হইলেও রেখাপাত একটু হয়ই।

নিত্য নূতন মুখ, নিত্য নূতন ভাষা, নিত্য নূতন রঙ-বেরঙ্ খবরের আমদানি রপ্তানির বেশ একটি ছোটখাট বন্দর! আমার কিন্তু ভালই লাগে। গ্রামের চেয়ে গ্রামের বহির্বাটিতে তাই দিবারাত্রের বেশী সময় কাটাইয়া দিয়াও আমার তৃপ্তি হয় না।

স্টেশন মাস্টার ত্রিলোচনবাবু হইতে শুরু করিয়া ফ্ল্যাটের কুলি জিকির আলি পর্য্যন্ত আমাকে একটু সমীহ করিয়া চলে।

ত্রিলোচনবাবুর একবার চোখ পড়ার অপেক্ষা মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে চোখের পুরাতন স্টীল ফ্রেমের চশমাটি খুলিয়া হুঁকাটি ত্রস্তে বাড়াইয়া ধরিয়া বলেন, এই যে আসুন।

সাগ্রহে হুঁকাটি হাত বাড়াইয়া লইয়া বলি, পূজো আসছে, তাইত', কাজের হিড়িক যে খুব দেখচি।

ত্রিলোচনবাবু গোলাকার গ্লোবের মত মুখটি তুলিয়া সামান্ত একটু হাসেন। আর তাহারই পার্শ্ববর্ত্তী রোগা ছিপ্‌ছিপে ছোক্‌রা ক্লার্ক মহেন্দ্র বেশ একটু ভারিক্কি চালে চোখমুখ আকাশে তুলিয়া বলে, মরবার ফুরসুত্‌ নেই দেখচেন না? আমরা বলে তাই কোন রকমে—

ত্রিলোচনবাবু মহেন্দ্রের বাক্যস্রোতে বাধা দিয়া বলেন, মহেন্দ্র, মরবার ফুরসুত্‌ না হোক্‌ বক্‌বার ফুরসুত খুব পাবে, কিন্তু আগে 'টোট্যাল'টা দিয়ে দাও ভাই, বুঝচ' না, স্টীমার এসে গেলে যে হাঁকপাঁক করতে হবে।

মহেন্দ্র কানের কলমটা নামাইয়া লইয়া মনে মনে কি যেন হিসাব করিয়া আবার আমার দিকে ফিরিয়া বলে, স্কুলে কোনদিন অঙ্ক রাইট করেছি বলে মনে পড়ে না, কিন্তু এমনই কর্ম্মের ফের যে ত্রিশ টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে সেই ছেলে বেলার ঋণ এখন সুদ শুদ্ধু আদায় ক'রে নিচ্ছে। এতো আর রাইট না ক'রে উপায় নেই, নইলে দাও নিজের গাঁট থেকে। আর এ পর্য্যন্ত দিয়েচিও কি কম?

ত্রিলোচনবাবু হাসিয়া বলেন, বেশী বক' ব'লেই না হিসেবে ভুল হ'য়ে যায় মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র হাতের খাতার উপর হইতে মুখ তুলিয়া বলে, ও ছাই বকলেও ভুল হবে না বকলেও ভুল হবে। কিন্তু তা ব'লে—

মহেন্দ্রের কাজের ক্ষতি হইতেছে বুঝিয়া বলি, আচ্ছা আসি তবে মহেন্দ্র।

আরে না, না, এরই মধ্যে যাবেন কি!—বলিয়া মহেন্দ্র আগাইয়া আসিয়া আমার একটা হাত চাপিয়া ধরে। তারপর আবার বলিয়া চলে, যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন—আরে ভুল ত' আমার হ'তেই হবে—তাব'লে এমন জমান আসরটা···বুঝচেন না ষোড়শীবাবু।

হাসিয়া বলি, তা আর বুঝি না।

ত্রিলোচনবাবু বিরক্ত হইতে জানেন না, তাই সস্নেহে বলেন, মহেন্দ্র, তাইত'—

মহেন্দ্র চট্ করিয়া একটা মালের বস্তার উপর চাপিয়া বসিয়া সামনের আর একটা বস্তার উপর হাতের খাতাটা পাতিয়া ধরিয়া বলে, এইত' শেষ ক'রে দিলাম বলে'·····ওরে জিকির, বাবুকে একটা চেয়ার এনে দেনা ···· রোজ না বললে তোদের হুঁস হয় না, না ?

জিকির আলি সবিনয়ে বলে, চেয়ার কোথায় পাব বাবু। আপিসের টুল দু'খানা—তাও আট্‌কে রয়েচে।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, নিন ঘোড়শীবাবু, তবে আমার চেয়ারটাতেই বসুন। হিসেবটা আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সেরে নি।

উপস্থিত সকলেই মহেন্দ্রের দিকে চাহিয়া হাসিতে থাকে। মহেন্দ্র চতুর্দ্দিকে একবার চাহিয়া কিছুক্ষণ পরে সকলের হাসির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া বলে, ও হরি, না, টাকা পয়সার যোগ মিলিয়ে মিলিয়ে মাথায় আর কিছু নেই দেখচি। মালের বস্তার ওপর বসেই সেটাকে চেয়ার ঠাওরালাম, এমন চাকরিও মানুষে করে আবার! কি বলেন ঘোড়শীবাবু ? না, চলুন আপিস ঘরেই যাওয়া যাক্।

ত্রিলোচনবাবু হাসিয়া বলেন, হিসাবটা ক'রে রাখতে ভুলো না মহেন্দ্র। স্টীমার আসার আগেই আমার চাই কিন্তু।

তা, তা দেখবেন, দেখবেন, ধরব আর শেষ করব বইত' না। বলিতে বলিতে মহেন্দ্র আপিস ঘরের দিকে চলিয়া যায়। আমাকেও সঙ্গে যাইতে হয়।

কারণ, মহেন্দ্র এত সহজে যে আমাকে রেহাই দিবে না তাহা ভাল করিয়াই জানি।

কথার পরে কথার জাল বুনিয়া চলিতে পাইলে মহেন্দ্র আর সব ভুলিয়া যায়। শেষে জালের মধ্যে এমনই জড়াইয়া পড়ে যে, আর কিছুরই

জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ থাকে না। এমন কি, চাকরি বজায় রাখিবার কথাও তাহার আর মনে থাকে না।

অল্প পরেই আপিস ঘরের জানালায় বহুলোকের ভিড় হয়। জানালার ফোকর দিয়া একসঙ্গে অনেকগুলি হাত টিকিট পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। মহেন্দ্র সে সব অগ্রাহ্য করিয়াই বলে, সবাই আমরা ভবঘুরে ঘোড়শীবাবু! বাবাত' জীবনের আদ্ধেকই যত সব বন জঙ্গল আর পাহাড় পর্ব্বতে কাটিয়ে দিলেন। শেষ বয়সে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে কাশীবাসী হ'লেন। তাও বরাতে বেশীদিন সইল না।.....বড়দা'র ত' পাত্তাই নেই। সেই যে কবে ঘরছাড়া হ'লো, আর কোনদিন ফেরার নামটিও করলে না। এখন মার্কিন দেশের কোন্ একটা ইউনিভারসিটির প্রোফেসর শুনি, মার্কিন একটা মেয়েকে বিয়ে ক'রে সেখানেই নাকি ঘর কন্না শুরু করেচে,—হবেও বা। চিঠি পত্তর ত' লেখে না আর! মেজদা'ত' নিকোবরেই শেষে ঘর তুলতে হ'ল বাধ্য। ওহো, সেকথা বলিনি বুঝি আপনাকে ঘোড়শীবাবু? মেজদা'রও একদিন কোন পাত্তা মেলে না; শেষে বছর দশেক নিরুদ্দেশে কাটিয়ে একদিন হঠাৎ একটা নিকোবরের মেয়েকে সঙ্গে ক'রে একেবারে দেশে হাজির। আমাদের ত' চক্ষুস্থির। গ্রামের লোক ছি ছি করতে লাগলো। কিন্তু মেজদা ত' চিরকালই বেপরোয়া কিনা। তারপরে একদিন খুব হেসে আবার বিদায় নিয়ে চ'লে গেল। যাবার বেলা শুধু আমাকে ব'লে গেল, 'মহেন্দ্র, চললাম ভাই। দেশের বুকে আমার আর স্থান নেই। মঞ্চুর সঙ্গে তোর পরিচয় হয় নি, নইলে বুঝতি দেশকে আজ আমি ছেড়ে যেতে চাই কেন।' নিকোবরের, ঐ মেয়েটার নাম মঞ্চু ঘোড়শীবাবু। ওর রূপের পরিচয় পেয়েছিলাম, কারণ, রূপকে আমাদের মত ওরা ঢাকা দিয়ে বিকৃত ক'রে তোলে না। আর যা পরিচয় তা ঐ মেজদা'র কথাতেই। তারপর সেজদা'র কথা ত' সবাই জানে—দেশের জন্যে হাসিমুখে গেল ফাঁসি কাঠে। আমিই শুধু

অভাগা ষোড়শীবাবু। নইলে, জীবনপাত করলাম এই ফ্ল্যাটে ব'সে অঙ্ক কষে কষেই। কিন্তু বিশ্বাস করবেন না ষোড়শীবাবু, আমারও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়, ভাবি, ·····আঃ, আপনারা পাগল ক'রে ছাড়বেন দেখচি ম'শাই। বলি স্টীমার আসতে এখনও ঢের দেরী, এরই মধ্যে টিকিট! টিকিট পেলেই কি সব নদী সাঁতরাবেন নাকি?

একজন ঘর্ম্মাক্ত বেঁটে লোক জানালার সামনে বিশ্রী কতকগুলি দাঁত বাহির করিয়া বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলে, টিকিট ত' দিন মশাই, তা'পর নদী সাঁতরাই কি না সে আমরা বুঝব।

মহেন্দ্র সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ভুলিয়া যাওয়া কথার খেই আবার ধরিতে চেষ্টা করে। আমি তাহার বিফল চেষ্টা দেখিয়া হাসিয়া বলি, মতিভ্রম না হবে কেন মহেন্দ্র, রক্তের সম্পর্ক ত' বড় সোজা জিনিস নয়।

তা যা বলেচেন ষোড়শীবাবু। আমাদের বংশের রক্তের গুণই এমন যে, ভবঘুরে না হ'য়েই আমাদের উপায় নেই। তাই ভাবি, কবে না জানি আপনাদের সব সঙ্গত্যাগ ক'রে যেতেই হয়।— বলিয়া মহেন্দ্র আর্দ্র চোখ দুইটি আমার পানে তুলিয়া ধরে।

মহেন্দ্রের ব্যথা যে কোথায় তাহা যদি বা বুঝি ত' তাহাকে সান্ত্বনা দিবার মত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। বলি, তোমার মা'র কথা মনে আছে মহেন্দ্র?

নেই নেই আবার! বলেন কি ষোড়শীবাবু। তাকে একবার যে দেখেচে সে আর কখনও ভুলতে পারে নি, ভোলা অসম্ভব। এক সময় আমাদের বাড়িতে খুব ঘটা ক'রে দোল দুর্গোৎসব হ'ত। দুর্গোৎসবে কম্‌সে কম একশ' পাঁঠা ত' বলি হ'তই - আজই না হয় ভিটেমাটির চিহ্নটি পর্য্যন্ত নেই। শুনেচি মা নাকি বলি বন্ধ করেন। কেমন ক'রে বন্ধ করেছিলেন শুনলে চম্‌কে যাবেন ষোড়শীবাবু, আর কেউ হ'লে কখনই পারত না। শ্বশুরবাড়ি প্রথম দুর্গোৎসবে এসে কোন মেয়েই অতটা পারে না

ষোড়শীবাবু। কাঠগড়ার পাশে বলির ছাগগুলোকে দেখে মা আর ঠিক থাকতে পারলেন না, ছুটে গিয়ে কাঠগড়ায় নিজের গলা পেতে দিয়ে প'ড়ে রইলেন, বললেন, 'আগে আমাকে বলি দেওয়া হ'ক, তারপর ঐ নিরীহ বেচারাদের বলি দেওয়া হবে।' সেই থেকে ঠাকুর্দ্দা আর কখনও মা'র মুখ দেখতেন না, কিন্তু বলি দিতেও আর কখনও তিনি সাহসী হন নি। মা'কে আজও কেউ ভোলে নি ষোড়শীবাবু, আমি কি ভুলতে পারি কখনও।—বলিয়া মহেন্দ্র চোখের সিক্ত পাতা কাপড়ে মুছিয়া লইয়া হঠাৎ টিকিটের খোপকরা আল্‌মারিটির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলে, কই, চট্‌পট্‌ বলুন সব—কি, আপনার কোথাকার ?··· · আরে সুরেশবাবু যে, কোথায়, ক'ল্‌কাতা চললেন নাকি ?

—রানাঘাট একখানা।

—আমার তিনখানা নৈহাটি দেবেন ত' মশাই।

—আমার কিন্তু ক'ল্‌কাতা···একখানা।

বহুলোকের একত্রিত কলরবের মধ্যে সুরেশবাবুর ক্ষীণকণ্ঠ চাপা পড়িয়া যায়।

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি একটা ধমক দিয়া বলে, আঃ, একজন একজন ক'রে হাত বাড়ান না মশাইরা।

কিন্তু কে তাহার কথায় কর্ণপাত করে।

বাড়ি ফিরিবার পথে প্রতিদিনই সূর্য্য মাথায় উঠিয়া পড়ে। মাঠঘাট তাতিয়া উঠিয়া পথ চলা অত্যন্ত ক্লান্তিকর করিয়া তোলে। মাঝে মাঝে গাছের ছায়া গ্রাম্য পথের বুকে পাওয়া যায় বলিয়াই যেটুকু শান্তি। কিন্তু তাহা না থাকিলেও আমাকে স্টেশনে যত কষ্ট স্বীকার করিয়াই হউক না কেন যাইতেই হইত। নদীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া কোনদিন মুগ্ধ হই নাই,

প্রকৃতির প্রতি আমার কোন মমতাই নাই—শত অভিনব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াও পৃথিবী আমাকে কোনদিন ভুলাইতে পারে নাই,……কিন্তু মানুষের সামান্য সুখ দুঃখের কাহিনী, হাসি-অশ্রুর আভাস আমাকে ব্যাকুল করে, মুগ্ধ করে, কাঁদাইতেও পারে। মহেন্দ্রের জন্য কতদিন গৃহে বসিয়া না জানি ভাবিয়াছি, সময় পাইলেই তাই স্টেশনে ছুটিয়া যাই—মহেন্দ্রকে ভাল লাগে, ওদের ছন্নছাড়া সংসারটির জন্য বুকে ব্যথা জাগে। মহেন্দ্রের কথার অন্তরে লুক্কায়িত মূল সুরটিকে সে নিজেও চিনিতে পারে নাই। সে সম্বন্ধে তাহাকে সজাগ করিয়া দেওয়াও আমি কোনদিন প্রয়োজন মনে করি নাই।

ওর সমস্ত অন্তর চায়—বড়দা, মেজদা তা'দের বিদেশিনী জীবন সঙ্গিনীদের সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া আসুক, আবার ঘর বাঁধুক…… ছন্নছাড়া সংসারটি আবার নূতন করিয়া জোড়া লাগুক্। ও তাহা হইলে যেন বাঁচিয়া যায়। মহেন্দ্র নানাভাবে জীবনের এই দৈন্যকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পায়, মাঝে মাঝে, রক্তে তাই তাহারও ছন্নছাড়ার গান বাজিয়া উঠে।…… ভাঙাঘর নূতন করিয়া আবার গড়ার এতবড় আগ্রহ আর কাহারও মধ্যে আমি দেখি নাই। কিন্তু তাহা আর হইবার নয় জানিয়াই জীবনের প্রতি মহেন্দ্র নিরাসক্ত। অকারণ-কথার ফেনিল সাগর গড়িয়া তাহাতে নিজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ডুবাইয়া দিয়া সে শান্ত হইতে চায়।……

বহুদিন এমনও হইয়াছে যে, আমি বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া স্নান সমাপনান্তে আহারে বসিয়াছি এমন সময় মহেন্দ্র ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া হাজির। সারাদেহে তাহার ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া চাহিতেই সে বলে, কাজ কর্ম্ম নাই তাই ত্রিলোচনবাবুকে বলে' ঝাঁ ক'রে চ'লে এলাম। ও হট্টগোলে আমার মাথার ঠিক থাকে না। তাই পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই। আপনার বাড়িটি কিন্তু ভারি চমৎকার ষোড়শীবাবু।

শেষের কথাটি মহেন্দ্রের মুখে বহুবার শুনিয়াছি, কিন্তু কোনদিন বিরক্তি আসে নাই। কথাটি ও সমস্ত প্রাণ দিয়া বলে বলিয়াই হয় ত'।

মহেন্দ্রকে অদূরের একটি আসনে বসিতে বলিয়া স্ত্রীকে ডাকিয়া বলি, মহেন্দ্র-এসেচে।

আর কিছুই আমার বলিতে হয় না। দেখিতে দেখিতে এক গেলাস জল ও থালায় সাজানো ভাত আসিয়া উপস্থিত হয়। মহেন্দ্র মৃদু একটু হাসিয়া শুধু বলে, আপনার ওপর ভারি অত্যাচার করচি কিন্তু। ওদিকে কুকারে নিজের রান্নাও চাপিয়ে এসেচি।

—তা হ'লই বা।

—না, আজ ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়েই খাব 'খন।

আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই আমার স্ত্রী ঘোমটাটি প্রায় সম্পূর্ণ তুলিয়া দিয়াই বলে, তা হবে না ঠাকুরপো। ক'দিন না বলেচি, কুকারটা পদ্মার জলে ডুবিয়ে দিতে? মহেন্দ্র ছোট একটি 'কিন্তু' বলিয়া আহার্য্যে হাত দেয়।

আমি খুসি হইয়া বলি, মহেন্দ্র, তোমরা যেমন কুকুর ওরা আবার ঠিক তেমনি মুগুর। কেমন, এক ঘায়েই শায়েস্তা।

মহেন্দ্র প্রাণ ভরিয়া হাসে।

পরদিন ভোরের কথাই বলিতেছি—আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কি একটা পাখা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে ভোরের আলোকে বীর রসাত্মক অভিনন্দন জানাইয়া সবে মাত্র ক্লান্ত হইয়া একটু থামিয়াছে। ঘুম ভাঙ্গিলে আর কথা নাই মনটা একছুটে স্টেশন-ঘাটার গোলমালের মধ্যে গিয়া হারাইয়া যায়। তারপরে দেহটাকেও কষ্ট স্বীকার করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে হয়—না হইলে মন বিকল হইয়া পড়িবে—এই ভয়েই।

ঘরের বাহিরে আসিয়াই ষ্টীমারের সিটি শুনিলাম। শুনিতে বেশ লাগে। কলের মজুরদের কাজে যাইবার তাগিদ লইয়া এ সিটি বাজে নাই, কি কেরানীর ছুটি শেষের প্রত্যাবর্ত্তনের পরওনা লইয়াও এই ষ্টীমার আসিয়া সময়ের মূল্য বুঝাইয়া বিশ্রী সুরে অন্তরে ঘা মারে নাই, ইহা সম্বলহীন প্রৌঢ়ের কর্ম্মহীন ক্লান্ত দিনটিকে নানা রূপে রসে ভরিয়া দিবার সুন্দর মোহন ইঙ্গিত। মুগ্ধ না হইয়া তাই থাকিতে পারি না।

দূরে ফাঁকা আর ফাঁকা, নিচে অতল জলরাশি, উপরে সীমাহীন আকাশ, দূরে, আরও দূরে সপিল একটি নীল রেখা আকাশের গা ঘেঁসিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, ওপারের বৃক্ষশ্রেণী এপারের কাছে সীমার নিশানা তুলিয়া ধরিতে গিয়া একটি মাত্র রেখায় আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

দু' একখানা নৌকা ভাসিতেছে।

আকাশে চিলও ভাসিতেছে।

সূর্য্যের ঠিক নাবোয় ধোঁয়া ছড়াইয়া সূর্য্যকে ম্লান করিয়া তুলিয়া ষ্টীমার-খানা ছুটিয়া আসিতেছে।

হঠাৎ মহেন্দ্রের কল্যকার কথা আমার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিয়াছিল, আর বেশী দিন নয় ষোড়শীবাবু, ডাক শীগ্‌গিরই এলো ব'লে·····ব্যস, তাহ'লেই উড়নচণ্ডী ভবঘুরে·····দিব্যি, কি বলেন?

কথাটার কোন উত্তর তখন দেওয়া প্রয়োজন মনে করি নাই। ভাল করিয়া কিছু জানিতেও চাহি নাই। কোথা হইতে ডাক আসিবে? কেন?·····কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই।

এখন মনে হইল, সত্যই মহেন্দ্র যদি এমনই একদিন চলিয়া যায়। আর তাহার শরীরে যে রক্ত বহিতেছে তাহাতে তাহার চলিয়া যাওয়াটা খুব আশ্চর্য্য কি? মনটা দুশ্চিন্তার অভিভূত হইয়া আসে। আরও দ্রুত, আরও সরব পদবিক্ষেপে স্টেশনের দিকে আগাইয়া চলি।

ত্রিলোচনবাবুর সঙ্গে ফ্ল্যাটের সিঁড়ির মুখেই দেখা হইয়া যাইতে তিনি

ম্লান একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলেন, মহেন্দ্র চল্‌লো·····বাঃ ও বুঝি কিছু বলে নি আপনাকে? ছোক্‌রাকে ভালবাসতেম কিনা, তাই আমাকে না জানিয়েই গোপনে গোপনে এমন কাণ্ডটি ক'রে বসল। পারলে ধ'রে রাখতেম, কিন্তু এখন আর নাকি··· ··যাক্‌গে, ওরা বংশ পরম্পরায় এম্‌নি উড়নচণ্ডীই চিরদিন শুনি।

মনটা বিষাইয়া উঠে। বলি, চল্‌লো মানে? কোথায় চল্‌লো আবার? ওর যে মরবার কোথাও জায়গা নেই শুনি?

ত্রিলোচনবাবু আর্দ্র কণ্ঠ সহজ করিতে চেষ্টা করিয়া বলেন, হুঁ, দেশে ওর মরবার জায়গা জুটলো না বলেই হয় ত' বিদেশে মর্‌তে চল্‌লো। ও বলে নি বুঝি, ও যে যুদ্ধে চল্‌লো, এডেন না মেসোপটেমিয়া কোথায় যাবে শুনি। এই ষ্টীমারেই ক'ল্‌কাতা চল্‌লো।

—এঁ্যা সত্যি?

কথাটা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অন্ততঃ, বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

ষ্টীমারের সিটি বিকৃত হইয়া বাজে।—

দূরে চলিয়া যায়। বড় পরিচিত মহেন্দ্র ষ্টীমারের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া—ইচ্ছা করে, জোর করিয়া উহাকে ফিরাইবার জন্য হাঁক ছাড়িয়া ডাকি; ষ্টীমারের গতি রুদ্ধ করি·····না থাক্‌।

ত্রিলোচনবাবু ডাকিয়া বলেন; চলুন, আপিস ঘরে ব'সে একটু গল্প গুজব করা যাক্‌।

রাজী না হইলেও তাহার সঙ্গ লই।

জিকির আলি আসিয়া সেলাম ঠুকিয়া বলে, মহিন্দের বাবু তা হ'লে গেলেনই আজ? অনেকদিন ধরেই যাব যাব করছিলেন।

মাঠের পথ ধরিয়া আর বাড়ি ফিরিতে পারি না। মনে হয় দূরে, বহুদূরে আমার ঘর পড়িয়া আছে।

এমন ঠাঁটা পড়া রৌদ্র ত' রোজই মাথার উপরে থাকিত কিন্তু পথ এত দীর্ঘ বলিয়া ত' কোনদিন মনে হয় নাই।

'আমারও মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয়, ষোড়শীবাবু'—মহেন্দ্র বলিয়াছিল।

মহেন্দ্র চলিয়া গিয়াছে··· ···কেহ তাহার জন্য চোখের জল ফেলিবে না··· সেকি হইতে পারে?

মা নিষাদ

গাঁয়ের নাম সন্ধ্যাতারা। গাঁয়ের উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়টির নাম 'প্রসন্নময়ী এইচ-ই স্কুল'। স্কুলটি দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে যথেষ্ট সুনাম কিনিয়াছে এবং গ্রাম্য স্কুলের পক্ষে ছাত্র-সংখ্যাও ইহার মন্দ না—প্রায় পাঁচ শ'র উপরে হইবে। স্কুলের লাগাও স্কুলেরই একটি হোষ্টেল আছে, বাহিরের ছাত্রদের থাকিবার জন্য সুব্যবস্থা করা আছে। হোষ্টেলের ছাত্র-সংখ্যা প্রতি বৎসর কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যে অদল-বদল হয়। এ বৎসর সেখানে বাইশটি ছেলে বর্ত্তমানে আছে এবং ইহা ছাড়াও হেডমাষ্টার মণিমোহন রায়কে বাদ দিলে আরও তিনজন মাষ্টার সেখানে থাকেন। ইঁহারা সকলেই ভিন্-গাঁয়ের লোক, শুধু ছাত্রদের মধ্যে একজন আছে—যে এই সন্ধ্যাতারা গাঁয়েরই ছেলে—তাহার নাম সুপ্রিয়। সুপ্রিয়কে হোষ্টেলে থাকিয়া লেখাপড়া করিতে হয়, যেহেতু তাহার পিতাকে চাকুরী ব্যপদেশে কেবল বিদেশে বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

স্কুল-হোষ্টেলটির ব্যবস্থা সুন্দর। মোট পঁয়ত্রিশজন লোক সেখানে অনায়াসে থাকিতে পারে, কিন্তু এত লোক এযাবৎ হোষ্টেলে হইতে দেখা যায় নাই। হোষ্টেলে হেডমাষ্টার মহাশয় সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, কিন্তু ছাত্রদের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান বা ব্যবস্থার ভার গ্রহণ করিয়াছেন অঙ্কের মাষ্টার করুণাকিঙ্কর বাবু। করুণাকিঙ্করবাবু লোক অতিশয় উদার এবং ছাত্রদের প্রতি যত্নের তাঁহার আর সীমা নাই। অনেক সময় ছাত্ররা তাঁহার এই অতিশয় যত্নে বিশেষ বিব্রত হইয়া ওঠে এবং তাঁহার কঠোর নিয়ম-অনুশাসনগুলি ভঙ্গ

না করিয়াও পারে না। ইহাতে করুণাকিঙ্করবাবু কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন না, কিন্তু হেডমাষ্টারের কানে তাহা কোনরকমে একবার উঠিলেই হোষ্টেলে প্রলয় শুরু হইয়া যায়! হেডমাষ্টার মহাশয় অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির লোক। শৃঙ্খলার দিকে তাঁহার কড়া নজর একেবারে—হোষ্টেলের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইবার উপায় নাই।

এই স্কুল ও হোষ্টেলটি একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ ভূমির উপর অবস্থিত এবং চারি পাশ দিয়া ইহার খাল বহিয়া গিয়াছে—বারমাসই এই খালগুলিতে জল থাকে, শুধু স্কুলের উত্তর দিকে—অর্থাৎ যেদিকে স্কুলের গেট সেইদিকের খালের উপর দিয়া পারাপারের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের একটি ভিৎ-বাঁধানো কাঠের পুল আছে। স্কুলের ওপারে পুলটি যেখানে মাটিতে ঠেকিয়াছে, সেখান হইতে একটা সড়ক গিয়া সোজা একেবারে গ্রামের প্রধান সড়কটির গায়ে মিশিয়াছে। এই প্রধান সড়কটাই বরাবর পূব দিকে চলিয়া গিয়াছে—সন্ধ্যাতারা গাঁয়ের বাজারখোলা পর্য্যন্ত। সন্ধ্যাতারা গাঁয়ের বাজার—মস্ত বড় বাজার এবং সপ্তাহে দুইদিন এই বাজারখোলাতেই সন্ধ্যাতারার হাট মেলে। দু'দশ-বিশ গাঁয়ের মধ্যে এতবড় বাজার আর নাই, এতবড় হাটও কোথাও আর মিলে না।

স্কুলের উত্তর দিকের খালের উপরের কাঠের পুলটি বেশ মজবুত এবং নিচেকার খালটি কোথাও না বাঁকিয়া-চুরিয়া বরাবর পূর্ব্ব-পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত সোজা চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিকে খালটি শেষ-পর্য্যন্ত গিয়া গাঁয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে আর পূর্ব্বদিকে সোজা এক শস্যাকীর্ণ মাঠে গিয়া মিশিয়াছে। পুলটি খাল হইতে প্রায় হাত দশেক উঁচু, এখান হইতে খালের এবং চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্য অতি মনোরম মনে হয়। হোষ্টেলের ছাত্ররা এবং গ্রামের আরও অনেকে বৈকালের দিকে এই পুলের উপর বসিয়া গল্পগুজব করে—যতক্ষণ-না সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসে; তার-পরে যে যাহার হোষ্টেলের কক্ষে বা বাড়ি ফিরিয়া যায়। এখন পূরা বর্ষা বলিয়া খালের

জল আরও উপরে উঠিয়াছে। ছাত্ররা বর্ষাকালে খালের পরিষ্কার জলের বাড়াবাড়ি দেখিয়া নিজেদের সংযম-শাসনে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। একদিন মাষ্টারদের চক্ষুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা পাইয়া পুল হইতে দল বাঁধিয়া খালের জলে লাফাইয়া পড়ে বিকালের দিকে। কিন্তু মাষ্টারদের চক্ষুকে সতাই আর তাহারা ফাঁকি দিতে পারে না; ফলে হোষ্টেলের ছাত্রদের উপর হেডমাষ্টার মহাশয়ের শাসনের তুমুল ঝড় বহিয়া যায়! আবার কিছুদিন ছাত্রেরা মনের দুঃখে পুলের উপর বসিয়া শুধু গল্পগুজবে বৈকাল কাটায়, তারপরে একদিন আচমকা যেন নিতান্ত অনিচ্ছাবশেই একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, শেষে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে নিজেও জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তারপরে একে একে অন্য সকলেও শাসন-ভয় ভুলিয়া জলে লাফাইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ অসম্ভব আলোড়নের পর যে-যাহার কক্ষে গোপনে প্রবেশ করে. কোনরকমে ভিজা-কাপড় ছাড়িয়া পাঠে অত্যধিক মনোনিবেশ করে। এক-আধদিন শাসনের হাত এড়াইতেও তাহাদের দেখা যায়।

এই বর্ষাকালটাই হোষ্টেলের ছাত্রদের বড় দুঃখে কাটে। দিগ্-দিগন্ত জলে জলাকার—কিন্তু হোষ্টেলের শাসনও সেই অনুপাতে কড়া হইয়া ওঠে। হোষ্টেলের একখানি নৌকা আছে, কিন্তু সে নৌকা ছাত্ররা বড় একটা ব্যবহার করিতে পায় না, তবে মাঝে মাঝে কোন মাষ্টারের খুশি হইলে ছাত্রদের সঙ্গে লইয়া বৈকালের দিকে গাঁয়ের পশ্চিম সীমান্তের জলে থৈ থৈ মাঠে নৌকা লইযা বেড়াইতে যান। এই পশ্চিম-সীমান্তের মাঠ বর্ষাকালে বড় মোহনীয় হইয়া ওঠে; পূবে সন্ধ্যাতারা গাঁ বাদ দিলে তিনদিকে সমস্ত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হইয়া শুধু জল আর জল বিরাজ করিতেছে, —দূরে দূরে নৌকা ভাসিতেছে—নৌকার লগিগুলি শূন্যে মাথা তুলিয়া আছে। আর যা চোখে পড়ে, সে জলের উপর মাথা-জাগানো সবুজ ধানের শিষ—সারা পশ্চিমের মাঠ জুড়িয়া। এই সব ধানের ক্ষেত দুইপাশে রাখিয়া

মাঝ দিয়া নৌকা চলার 'দারা' গেছে। এই দিগন্তগ্রাসী জলরাশি হাওয়ায় উচ্ছল কলনাদ করিয়া উঠিতেছে। জলের শেষ-প্রান্ত ছুঁইয়া পশ্চিমের আকাশে আগুন জালিয়া সোনার সূর্য্য অস্তে নামিতেছে—সে অপূর্ব্ব শোভার আর তুলনা নাই। মানুষ পাগল হইয়া যায়! ছাত্ররা হোষ্টেলের কারায় আবদ্ধ থাকিয়া পশ্চিমের মাঠের স্বপ্নে বিভোর হইয়া ওঠে। বিশেষ করিয়া দিনান্তে হোষ্টেলের ছাত্রদের মধ্যে যাহাকে এই পশ্চিমের মাঠ ব্যাকুল করিয়া তোলে, যাহার অন্তরাত্মা পশ্চিমের মাঠের মুক্তির স্বাদের জন্য কুঁক্ পাড়িয়া কাঁদে—সে পরাশর। পরাশরের প্রকৃতি একটু অনন্যসাধারণ, পরাশুনায় সে ভাল, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বৃত্তি পাওয়ার তার বিশেষ সম্ভাবনা, কিন্তু বাহিরের জগৎ তার পরমাত্মীয়। পশ্চিমের মাঠে নৌকার 'পরে বসিয়া সে রাতের পর রাত কাটাইয়া দিতে পারে। প্রকৃতি তাহার কবি-সুলভ। মাঝে মাঝে হোষ্টেলের শাসন-নীতির বিরুদ্ধাচরণ সে করিয়া বসে, করুণাকিঙ্করবাবুর ঘর হইতে মাঝে মাঝে সে নৌকার চাবি চুরি করিয়া সমস্ত শাসনে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া, পশ্চিমের মাঠেই হয়তো একা-একাই সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া আসে। সমস্ত শাসন নির্ব্বাকে মানিয়া লইয়া অপরাধীর মত অতি চুপে চুপে হোষ্টেলে প্রবেশ করে, কিন্তু সমস্ত শাসন নির্য্যাতনের পরেও তাহার মনের মুকুরে জাগিয়া থাকে পশ্চিমের মাঠের অস্তসূর্য্য ;—অস্তসূর্য্যের রশ্মিপাতে সোনালী হইয়া ওঠা ধানের শিষ, দূর দিগন্তের জলের কলনাদ—কলোচ্ছ্বাস! এত জলের মায়া পরাশরকে কেমন মুগ্ধ করিয়া তোলে, সে শত শাসনের বালাই ভুলিয়া যায়, কোন কিছু বাধাই আর সে মানিয়া চলিতে পারে না। কিন্তু একদিনের জন্যও পরাশর একটি মিথ্যাকথা কহিয়া শাসনের হাত এযাবৎ এড়াইতে প্রয়াস পায় নাই। কত জ্যোৎস্না রাত্রে সে ঘর ছাড়িয়া স্কুলের উত্তরের পুলের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া দিয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গানের কলি আওড়াইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কতরাত্রে সে যে শয্যায় পাশ-

মোড়া দিয়া কাতরাইয়াছে—দূরের খালের কেরায়া-নাওয়ের মাঝির উদাস ভাটিয়ালী গানের টান শুনিয়া ! কত রাত্রে সে যে সপ্ন দেখিয়াছে, গাঁয়ের খালে খালে তাহার বিরাগী মন নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া মরিতেছে - তাহার আর সীমা-পরিসীমা নাই। হোষ্টেলের সকল শাসন-বন্ধন তাহার কাছে কত তুচ্ছ হইয়া গেছে—ভাল ছাত্রের প্রাপ্য গৌরব কোনদিনই তাহাকে এই উদাসীর ডাক হইতে মুক্তি দিতে পারে নাই। কিন্তু পরাশরের জন্য স্কুলের মাষ্টারদের দুর্ভাবনার আর শেষ নাই। পরাশরের মত ছাত্র এযাবৎ স্কুলে আর একটিও আসে নাই, মাষ্টারদের ধারণা পরাশরের দ্বারা স্কুলের মুখোজ্জ্বল হইবে। পরাশরের কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নাই।

সেরাত্রে জ্যোৎস্না যেন তাহার সকল তূণ লইয়া দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর হইতেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছিলাম, পরাশর ক্রমেই কেমন যেন মন-মরা হইয়া পড়িতেছে। দলে পড়িয়া সকলের সঙ্গে সেও আহার করিয়া উঠিল, কিন্তু আহারে বসিয়া সে কাহারও সঙ্গে একটা কথাও কহিল না। আমরা পরাশরের সহপাঠি যাহারা—তাহারা পরাশরের এই মন-মরা হইয়া পড়ার কারণ বহুপূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু করুণাকিঙ্করবাবু ইহা লক্ষ্য করিলেও কারণ কিছু আবিষ্কার করিতে পারিতেছিলেন না। বাহিরে ভরপুর জ্যোৎস্না—পশ্চিমের মাঠ আজ পরাশরকে প্রবল হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, পরাশর জটিল শাসন-পাশে আবদ্ধ প্রাণীর মত শুধু অন্তরে অন্তরে দাপাইয়া মরিতেছে। পরাশরের অন্তর আমরা এতদিনের মেলামেশার ফলে তাহার মুখেই প্রতিফলিত দেখিতে পাইতাম।

করুণাকিঙ্করবাবু পরাশরের ভারাতুর মুখের পানে চাহিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পরাশর, তোমার কি অসুখ করেছে কোন'···?

পরাশর সুন্দর একটু ঘাড় কাত করিয়া বলিল, কই, নাতো !

করুণাকিঙ্করবাবু আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া আহারান্তে উঠিয়া গেলেন।

আহারাদির পর পরাশর কাহারও সঙ্গে কোন কথা না বলিয়া নিজের আলোটি নিবাইয়া দিয়া মাথার দিকের জানালার ঝাপটা তুলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। আমরা তাহাকে এত তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িতে দেখিয়া সহজেই বুঝিলাম যে, পরাশর না-জানি আজ কি নূতন মতলব আঁটিয়াছে ! একে একে হোষ্টেলের সমস্ত আলোই নিবিয়া গেল, জ্যোৎস্না যেন সমস্ত হোষ্টেলটির উপর জাঁকিয়া বসিল।

হোষ্টেলে যখন কোন জনপ্রাণীর আর সাড়া মিলিতেছিল না, তখন পরাশর চুপি চুপি তাহার শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল, তারপরে আমার কাছে আসিয়া আমার গা অতি চুপি চুপি ঠেলিয়া ডাকিল—মানব ! মানব !

আমি জাগিয়াই ছিলাম, আস্তে তাহার ডাকে সাড়া দিলাম। পরাশর আমার হাত ধরিয়া আস্তে টান দিয়া অতি সাবধানে বলিল, বেরিয়ে আয়, কথা আছে।

অতি সন্তর্পণে আমরা ঘরের দরজা শব্দ না করিয়া খুলিয়া বাহিরে আসিলাম তারপরে পা টিপিয়া টিপিয়া আমরা স্কুলের উত্তরদিকের পুলটির উপরে আসিয়া উভয়ে পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিলাম।

পরাশর সেখানে আসিয়া তন্ময় হইয়া বসিয়া রহিল ! তারপর কিছুক্ষণ কাটিয়া গেলে, পরাশরের স্বপ্নাতুর চোখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, কি, এখানে ব'সে থাকতেই এলি নাকি শুধু ?

পরাশর আমার একখানা হাত সাহ্লাদে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কি, চমৎকার জ্যোৎস্না দেখ তো, এখন কি মাষ্টারদের শাসন মেনে ঘরে ঘুমিয়ে থাকতে কারও ইচ্ছে করে ? ভাল কথা, রাস্তু গোয়ালের বাড়ী থেকে

গিয়ে এখন ক্ষীর নিয়ে এলে হয়, বেশ মজা ক'রে এখানে ব'সে খাওয়া যেত কিন্তু, টাকা যা' লাগে আমি দেব।

পরাশরের কথায় আমার কিছুমাত্র হাসি পায় নাই! কেননা, রাত্ত দুপুরেও আমরা বাজী ফেলিয়া এমন ক্ষীর আনাইয়া খাইয়াছি, কিন্তু তখন ছিল 'খড়ালি' কাল—নৌকার কোন বালাই ছিল না. এখন এক-পা চলিতে গেলেই যে নৌকার প্রয়োজন! সেই নৌকা এত রাত্রে এখন কোথায় পাওয়া যাইবে? করুণাকিঙ্করবাবুর ঘরে এখন খিল দেওয়া। হোষ্টেলের নৌকার চাবি চুরি করারও কোন সম্ভবনা নাই। কাজেই বলিলাম, নৌকা কোথায় পাব' এই রাত ক'রে?

পরাশর মৃদু একটু হাসিয়া বলিল, সে ব্যবস্থা কি আর আমি না করেছি! বেশ. ক্ষীর তুই যত খেতে পারিস্ খাওয়াব, কিন্তু আমাদের সঙ্গে আজ পশ্চিমের মাঠে যেতে হবে এই রাত ক'রে।

পরাশরের প্রস্তাবে রাজী হইলাম।

অল্পপরেই একখানি নৌকা চলার শব্দ পাওয়া গেল এবং নৌকাখানি পুলের দিকেই আগাইয়া আসিতেছিল।

পরাশর মহা আনন্দে আমার একটি হাত জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, আনন্দ আর বলরামকে নৌকা নিয়ে আসতে ব'লে দিয়েছিলাম। আজ রাত্রে ওদের নৌকায় ক'রে পশ্চিমের মাঠে বেড়াতে নিয়ে গেলে ওদের যত খুশি ক্ষীর খাওয়াব বলেছি। ওরাই বোধ হয় দু'জনে আসছে।

পরাশরের কথাই ঠিক; আনন্দ আর বলরাম পুলের নিচে কোন শব্দ না করিয়া তাহাদের নৌকা লাগাইল। পরাশর ও আমি তাহাদের ইঙ্গিত মত ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া গিয়া নৌকায় উঠিলাম। আনন্দ বুদ্ধি করিয়া খান পাঁচেক বৈঠা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। আমরা এক-একখানি বৈঠা তুলিয়া লইলাম। পরাশর আনন্দকে সরাইয়া দিয়া পিছুকার গোলুইয়ে হাল ধরিবার জন্য গিয়া বসিল। আনন্দ কিছুমাত্র আপত্তি করিল না,

যেহেতু এ সমস্ত আয়োজনই পরাশরের খেয়াল মিটাইবার জন্য। পরাশর তাহার কথা রাখিতে প্রথমে রাশু গোয়ালের বাড়ির উদ্দেশ্যে চলিল, তার পরে সেখান হইতে এক সের ক্ষীর লইয়া বলরামদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে আমরা চলিলাম। বলরাম আনুষঙ্গিক আর সমস্ত কিছু···'হুড়ুম' (মুড়ি) কলা ও চিনি তাহাদের বৈঠকখানা ঘরে ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছিল এবং সেখানে রীতিমত হল্লা হইলেও কেহ জানিতে পারিবে না এমন অভয় পাওয়া গেল। এই রাত দুপুরে এভাবে গোপনে খাওয়ার আনন্দ চরমভাবে লাভ করিয়া বলরাম বলিল, দূর ছাই, এই রাত ক'রে কোন্ চুলোয় যাবি মরতে, তার চেয়ে আয় ব'সে ব'সে তাস পিটি। শেষরাতের দিকে তোদের হোষ্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসবো 'খন, কেউ জানতে পারবে না।

সকলেই আমরা রাজী ছিলাম, কিন্তু পরাশরকে কিছুতেই রাজী করান গেল না। পশ্চিমের মাঠের জ্যোৎস্নাপ্লাবী রূপ তখন তাহাকে পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

পশ্চিমের মাঠেই শেষে যাওয়া গেল।

উত্তাল জলরাশির শিয়রে যেন পূর্ণচন্দ্র দাঁড়াইয়া হাসিতেছে! শুধু পরাশর কেন—আমরাও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলাম না।

অল্পপরে পরাশরের অনুরোধে আনন্দ একখানি ভাটিয়ালী গান ধরিল। আনন্দর গলায় ভাটিয়ালি গান ভারী মিঠা লাগিতেছিল। আনন্দর গলা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিল। বৈঠাগুলি একে একে নৌকায় তুলিয়া রাখা হইল। নৌকা বাতাসে বাতাসে যেদিকে খুশী ভাসিয়া চলিল।

এমনই করিয়া কতক্ষণ যে কাটিয়া গেল···তাহা আর কাহারও হুঁস ছিল না। পরাশর কিছুতেই আর ফিরিতে চায় না! মুখ-চোখের চেহারা তাহার হইয়াছে তখন একরকম! চোখ দুইটি ঈষৎ যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে, সামান্য লালও যেন হইয়াছে। পরাশর যেন মাতাল হইয়া উঠিয়াছে।

পশ্চিমের মাঠ দিয়া সন্ধ্যাতারা গাঁয়ে ঢুকিতে হইলে শাণবাড়ির খালের মুখ দিয়াই প্রবেশ করিতে হয়। আমরা পশ্চিমের মাঠ হইতে নৌকা লইয়া সেখান দিয়াই গাঁয়ে প্রবেশ করিতেছিলাম। হঠাৎ দেখি, শাণবাড়ির খালের মুখে দুইদিকে যে দুইটি গাব গাছ একেবারে জল হইতে উঠিয়াছে—তাহারই কাছে দুইটি নৌকায় লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। বুঝিলাম, কাহারা যেন মাছ ধরিবার আয়োজন করিয়া রাত থাকিতে 'দানা' আটকাইতে আসিয়াছে। কাছে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, সন্ধ্যাতারা গাঁয়ের ছেলেরাই, কেহ কেহ আবার আমাদেরই সহপাঠি। শাণবাড়ির খালের মুখের এই 'দানা'টি সকলেরই লক্ষ্যবস্তু। এখান দিয়া নাকি হাজারে হাজারে ঝাঁক বাঁধিয়া মাছ উজান ঠেলিয়া চলাচল করে! রাত থাকিতে এ 'দানা' না আটকাইলে দখল পাওয়া অসম্ভব। এই 'দানা'য় মাছ ধরার কলকৌশল একটু নূতন রকম। খালের দুই পাড়ের গায়ের সঙ্গে দুইটি নৌকা লম্বালম্বি কোন গাছের সঙ্গে বাঁধিয়া বা লগি পুঁতিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া এক এক নৌকার এক এক মাথায় একজন করিয়া লোক দাঁড়াইয়া পাতলা চারিটি বাঁশের লগির মাথায় চতুষ্কোণ একটি জালের এক একটি কোণ বাঁধিয়া সেই বাঁশের লগি ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়,—খালের স্বচ্ছ জলে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া জালটি ডুবাইয়া রাখিয়া। ঝাঁক বাঁধিয়া মাছ উজান ঠেলিয়া মাঠ হইতে খালের মধ্যে প্রবেশ করে। ঝাঁকের সাম্‌নেকার কতকগুলি মাছ জাল ছাড়াইয়া গেলেই একসঙ্গে সকলকে সেই বাঁশের লগি সমেত জাল টানিয়া তুলিতে হয়। মাছগুলি জাল টানার শব্দে পিছু ফিরিতে গিয়া জালে আটকা পড়িয়া যায় সাধারণত 'দানা' দিয়া চলাচল করে 'নলা' মাছের ঝাঁক। মাঝে মাঝে এত মাছ চলে যে, ছেলেরা নৌকা বোঝাই করিয়া মাছ ধরিয়া আনে তাহাদের এই 'চার ঠইনা জাল' দিয়া।

পরাশরের সহসা স্বপ্নের ঘোর কাটিয়া গেল! সে তাহাদের কাছাকাছি

আসিয়া নীলকণ্ঠকে তাহাদের নৌকায় দেখিয়া বলিল, হাঁরে নীলকণ্ঠ মাছ ধরার আয়োজন হ'চ্ছে বুঝি ? কাল দুপুরে তো মাছ চলবে !—তা এখন থেকে 'দানা' আটকে বসে থাকবি নাকি ?

নীলকণ্ঠ উত্তরে বলিল, তাছাড়া উপায় কি, নইলে 'দানা' খালি পাওয়া যাবে কেন ?

পরাশর বলিল, ও বাবা ! এত কষ্ট ক'রে 'দানা' আটকাতে হয় ? কাল দুপুরে যদি আসি তো আমাকে জাল টানতে দিবি' নীলকণ্ঠ ? আমার ভারি সখ, কিন্তু কখনও এভাবে মাছ ধরি নি ! আর হোষ্টেলে জানাজানি হ'য়ে যাবে, নইলে তোদের সঙ্গে থেকে যেতাম এখানেই।

নীলকণ্ঠ বলিল, আসিস কাল টানতে দেব। কাল তো রবিবার আসতে কোন অসুবিধা হবে না। আসিস কিন্তু।

তারপরে নীলকণ্ঠ আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিল, তোরা সব গেছলি কোথায় ?—পশ্চিমের মাঠে বুঝি ?

উত্তরে জানাইলাম, হুঁ।

তারপরে আনন্দ ও বলরাম আমাদের হোষ্টেলে চুপিসাড়ে পৌঁছাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল। আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাজেই অল্প আয়াসেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন ভোরে উঠিয়া পরাশরের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিলাম যে. সে বাকী রাতটুকু একবারও চোখের পাতা বুজিতে পারে নাই।

পরাশরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার আগেই সে আমার অতি কাছে আসিয়া ভারী গলায় অতি আস্তে করিয়া বসিল, পশ্চিমের মাঠের কি চমৎকার রূপ মানব, আমি কাল একবারও চোখের পাতা বুজতে পারি নি. শুধু স্বপ্ন দেখেছি। আবার একদিন যাবি এমনি ?

চুপ ! বলিয়া পরাশরকে একটু দূরে ঠেলিয়া দিলাম, কারণ, অদূরে

করুণাকিঙ্করবাবুর খড়মের আওয়াজ শুনিতে পাইয়াছিলাম। পরাশরও আমার কথার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

কয়েকদিন ধরিয়া পরাশরকে দেখিতেছিলাম, সে আমাদের হোষ্টেলে নিত্য যে মদন জেলের ছেলে অক্ষয় জেলে মাছ দিয়া যায়···তারই সঙ্গে কি যেন অনেক কথাবর্ত্তা বলিতেছে। তখনই বুঝিয়াছিলাম, পরাশর অক্ষয়ের সঙ্গে কি যেন নূতন কিছু করিবার মতলব ভাঁজিতেছে। পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানা গেল না। সে শুধু বলিল অক্ষয়ের কাছে ওর পদ্মায় ইলিশ মাছ ধরার গল্প শুনি। ওরা ওদের জেলে ডিঙ্গিতে ক'রে রাত থাকতে পদ্মায় বেরিয়ে যায় মাছ ধরতে, আবার আটটার মধ্যেই গাঁয়ে ফিরে আসে। ঐ অক্ষয় নাকি পদ্মার ঝড়ে অনেকবার পড়েছে।—সেই সব গল্প শুনি ওর কাছে।

পরাশর আর বিশেষ কিছু ভাঙ্গিয়া বলিল না। আমিও আর চেষ্টা করিলাম না। আমাদের সে রাতের পশ্চিমের মাঠের অভিযান আজও কেহ হোষ্টেলের জানিতে পায় নাই, কিন্তু তার পরের দিন পরাশর মধ্যাহ্নে যে শাণবাড়ির খালে মাছ ধরিতে গিয়াছিল, তাহা সকলেরই কানে উঠিয়াছিল এবং সে জন্য হেডমাষ্টার মহাশয় স্বয়ং পরাশরকে গুনিয়া গুনিয়া বেতের ঘা মারিয়াছিলেন। পরাশর সে বেত্রাঘাত অতি সহজভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেজন্য কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করে নাই। বরং আমার সঙ্গে দেখা হইলে হাসিয়া ফেলিয়া সহজভাবে বলিয়াছিল, কি বা মার খেলাম, কিন্তু নীলকণ্ঠের কাছে এক নতুন জিনিস শিখলাম, মানব। ওভাবে দল বেঁধে মাছ ধরতে যাওয়ায় ভারী আনন্দ! তুই যে কেন যেতে রাজী হলি না! ভারী ভাল লেগেছে আমার। নীলকণ্ঠ ব'লেছে, আমার একদিন একটা ভাল 'দানা' পেলে পরে খবর দেবে আমায়। একসঙ্গে

অত মাছ ঝাঁক বেঁধে চলতে কখনও এর আগে আমি দেখি নি। দেখতে ভারি ভাল লাগে!

অক্ষয়ের সঙ্গে পরামর্শের কয়েকদিন পরেই ভোরে উঠিয়া পরাশরকে আর হোষ্টেলের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলেরই বিশেষ ভাবনা ধরিয়া গেল! মাষ্টারেরা হোষ্টেলের অন্যান্য ছাত্রদের উপর যথেচ্ছ তম্বি করিতে লাগিলেন, পরাশরের অন্তরঙ্গদের উপর তম্বিটা আবার একটু জোর চলিতে লাগিল, কিন্তু পরাশরের খবর আমরা কেহই বলিতে পারিলাম না। আমার কেবল যেন একটা সন্দেহ হইয়াছিল যে, অক্ষয়ের সঙ্গে আবার তাহাদের জেলে-ডিঙ্গিতে পদ্মার ইলিশ মাছ ধরা দেখতে গেল না তো? ও যা ছেলে—তা ও পারে। বাড়ির কাছে পদ্মা, অথচ পদ্মা ও কখনও জীবনে দেখে নাই, লোকের মুখে গল্প শুনিয়াছে। গল্প শুনিয়া শুনিয়া পদ্মা সম্বন্ধে ওর একটা ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল এবং পদ্মার সে ভীষণ রূপ—'কীর্ত্তিনাশা' কেন যে তাহার নাম হইল, সেই সব স্বচক্ষে না দেখিয়া আসিতে পারিলে যেন কিছুতেই আর তাহার অন্তরের ক্ষুধা মিটিতেছিল না। সন্ধ্যাতারার পশ্চিমের মাঠে বর্ষার নাচন দেখিয়া যে বিমুগ্ধ হইয়া যায়—সে কি শুধু পদ্মার গল্প শুনিয়া দিন কাটাইতে পারে! কতদিন আমারই কাছে সে পদ্মা দেখার কত নূতন নূতন মতলব আঁটিয়াছে। কতদিন সে বলিয়াছে, সন্ধ্যাতারা গাঁয়ের কত কেরায়া নাও তো তারপাশা ষ্টীমারঘাটে যায়; একদিন সে তাহাদেরই একটার সঙ্গে বন্দোবস্ত কয়িয়া পদ্মা দেখিয়া আসিবে। কিন্তু এযাবৎ সে তেমন কোন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। কাজেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে হয়তো অক্ষয়ের জেলে-ডিঙ্গিতে করিয়া পদ্মা দেখিতে গিয়াছে। কিন্তু সে কথা আমি ভয়ে আর কাহারও কাছে প্রকাশ করিলাম না।

সেদিন সকালে অক্ষয়ও যখন আর হোষ্টেলে মাছ দিতে আসিল না, তখন আর আমার কোন সন্দেহই রহিল না যে, পরাশর অক্ষয়কে মতলব দিয়া

তাহারই সঙ্গে পদ্মায় গেছে। একথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিলাম না। এমন কি, হেডমাষ্টার মহাশয়, যখন রাগে গর্জ্জাইতে লাগিলেন তখনও চুপ করিয়া গেলাম! পরাশরের জন্য সকলের প্রাণেই তখন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু অক্ষয় যে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে তাহা ঘুণাক্ষরেও কেহ অনুমান করিতে পারিল না। আমিও তাই সে সম্বন্ধে নীরব থাকিয়া গেলাম।

সেদিন আর পরাশর ফিরিয়া আসিল না। আতঙ্ক ক্রমেই সবার বাড়িতে লাগিল। হেডমাষ্টার মহাশয় মহাসমস্যায় পড়িলেন, এ অবস্থায় পরাশরের বাড়িতে খবর পাঠান সমীচীন হইবে কি না। পরাশরের বাড়ি সন্ধ্যাতারা গাঁ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে বন-মাধুরী গাঁয়ে। শেষে ঠিক হইল, আজিকার রাত্রিটা দেখিয়া খবর পাঠাইবেন। রাত্রেও কন্তু পরাশর ফিরিয়া আসিল না। সারারাত্রি পরাশরের দুশ্চিন্তায় হোষ্টেলের কাহারও চোখে আর নিদ্রা আসিল না: হেডমাষ্টার মহাশয় ও করুণাকিঙ্করবাবু সারারাত হোষ্টেলের বারান্দায় পাগলের মত পায়চারি করিয়া ফিরিলেন। শেষে ভোরবেলা পরাশর হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিল।

পরাশরের মুখ চোখের চেহারা, তখন হইয়াছে অন্য একরকম। পরাশরকে ভাগ্যবান বলিতে হয়, যে হেতু সে সারাদেহে জ্বরের ভীষণ শাসন লইয়া হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিয়াছিল। হোষ্টেলে ফিরিয়াই সে শয্যা গ্রহণ করিল। হেডমাষ্টার মহাশয় এত রাগও সামলাইয়া লইয়া পরাশরের জন্য ডাক্তার ডাকাইয়া আনিলেন এবং পরাশরের যাহাতে কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তদ্রূপ ব্যবস্থা করিতে সকলকে আদেশ দিলেন। পরাশরের জ্বর ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। হোষ্টেলের সকলকে পরাশর রীতিমত ভীত এবং সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। পরাশরের জ্বরের প্রাবল্যহেতু পরাশরের অতবড়

অপরাধও সকলে দিন কয়েক পরে ভুলিয়া গেল। সেদিক দিয়া আর কোনও উচ্চবাচ্য হইল না। পরাশরই শেষে একদিন জ্বরের মুখে বলিল, সত্যি মানব, জীবনে আমি এমন জিনিস আর দেখি নি কখনও। অক্ষয়ের কাছে আমি জন্ম জন্ম ঋণী হ'য়ে থাকবো। পদ্মার কি ভীষণ সুন্দর মূর্ত্তি! পদ্মা যে দেখে নি মানব, তার জীবনই বৃথা। আমি ভাল হ'য়ে আবার অক্ষয়ের ডিঙ্গিতে যাব একদিন—পদ্মা দেখতে। আমার একটুও ভয় করে নি পদ্মা দেখে। পদ্মায় আমি জেলে ডিঙ্গির হাল ধ'রেছিলাম, অক্ষয় তো ভয়ে সারা, কিন্তু আমার একটুও বুক কাঁপে নি!—সন্ধ্যেবেলা পদ্মার কি চমৎকার মূর্ত্তি!

পরাশর আরও কি যেন বলিতে যাইতেছিল, তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলাম, এখন তুই থাম পরাশর, জ্বর ভাল হ'লে একদিন তুই বলিস সব, আমরা শুন্‌বো।

হঠাৎ পরাশর বলিয়া উঠিল, পদ্মায় আমি ডুবে মরলে সে কি চমৎকার হ'ত! সত্যি, আমার মৃত্যু যেন ভগবান পদ্মার বুকেই লিখে থাকেন। এর চেয়ে আর চমৎকার মৃত্যু মানুষের হ'তে পারে না।

পরাশরকে একটা ধমক দিয়া বলিলাম, আঃ, তুই থাম্ পরাশর। এত কথা কইলে জ্বর তোর কোনদিনই ছাড়বে না।

পরাশর আবার বলিল, পদ্মা আমার পরম আত্মীয়, মানব, তারও বুকে আমারই মত অসহ্য জ্বালা!

অগত্যা হেডমাষ্টার মাহাশয় এদিকে আসিতেছেন জানাইয়া দিয়া পরাশরের প্রলাপ থামাইলাম।

কিছুক্ষণ পরে সে আবার বলিল, কই, হেডমাষ্টার মশাই তো এলেন না? আমি কান পেতে পদ্মার ডাক শুন্‌তে পাচ্ছি মানব। কাল স্কুল-লাইব্রেরী থেকে আমাকে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' খানা এনে দিবি? রবীন্দ্রনাথের পদ্মা কবিতাটি আমি আবার পড়বো।

দেব, দেব, তুই এখন চুপ ক'রে ঘুমোতো। এত অশান্ত হ'লে কি রোগ সারে কখনও।—বলিয়া পরাশরের মাথায় ও কপালে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম।

পরাশর কি যেন বলিতে চেষ্টা করিয়া থামিল। তারপরে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেল।

পরাশরের জ্বর ভাল করিয়া সারিলে হেডমাষ্টার মহাশয় একদিন তাহাকে ডাকিয়া নিয়া শুধু ধমকাইয়া দিলেন। পরাশর মুখ ভার করিয়া ফিরিয়া আসিল।

ইহারই দিন দশেক পরে নাকি সে একরাত্রে অতি চুপে চুপে একা একা হোষ্টেলের নৌকা লইয়া পশ্চিমের মাঠে গিয়াছিল তাহার এ নৈশ-অভিযানের কথা কেহই জানিতে পারিত না, এমন কি, আমিও জানিতে পারিতাম না, যদি-না সে সে-রাত্রের ভয় পাওয়ার গল্প আমার কাছে করিত। অতি সঙ্গোপনে সে আমার কাছে সেদিন বলিয়া ফেলিল, খাল দিয়ে নৌকা বেয়ে হোষ্টেলে ফিরছি—হঠাৎ দেখি, চক্কোত্তি বাড়ির পিছুকার খালের জলে ঝুঁকে-পড়া পিটুলি গাছটার সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে তার মাথার বঁড়শিতে একটা মস্ত ইঁদুর গেঁথে জলে ঠিক লাগে এমন ভাবে কে যেন রেখে গেছে। বড় বড় বোয়াল বা শোল মাছ ধরবার ফিকির করেছে। হঠাৎ নৌকাটা সেখানে এসে পড়তেই পিটুলি গাছের উপর একটা ঝট্‌পট্‌ শব্দ শুনেই চম্‌কে চাইলাম, তারপরেই জলের ওপর কি যেন একটা মস্ত লম্বা জিনিস ছিটকে পড়লো। জলের দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে রইলাম ; একটা লম্বা কি জিনিস যেন জল কেটে কেটে পিটুলি গাছটার গোড়া দিয়ে পাড়ের দিকে গিয়ে উঠলো। যতদূর দেখে বুঝলাম তাতে মনে হল, একটা মস্ত সাপ যেন। বুকটা কেমন করতে লাগলো। অতি ভয়ে ভয়ে নৌকা নিয়ে খাল দিয়ে তাই পালিয়ে এলাম।

পরাশর থামিলে বলিলাম, তুই একদিন মরবি এম্‌নি ক'রে শেষে। সাপরে, সাপ! সাপ, ছাড়া আর কি হবে। ওগুলো ভীষণ বিষাক্ত সাপ—'মেছোপাঙাশ' ওদের নাম। এম্‌নি জলের ধারে ধারেই ওরা থাকে - কাটলে পরে কারও আর রক্ষে থাকে না—ভীষণ বিষাক্ত সাপ! মাঝে মাঝে শঙ্খচূড়ও বেরোয় বটে—তারও ভীষণ বিষ, তবে কেউ কিছু না বললে পরে—সে কিছু ক্ষতি করে না কারও; কিন্তু কাটলে পরেই পরমায়ু তার শেষ হ'ল বুঝতে হবে।

পরাশর সহসা যেন কাঁপিয়া উঠিল। সে এমন ভাব করিল যেন সে মৃত্যুর হাত হইতে সেরাত্রে বাঁচিয়া আসিয়াছে। তারপরেই আবার বলিল, কিন্তু মরণ যদি লেখাই থাকে তো লোহার ঘর ফুড়েও সাপ এসে কাটবে, লক্ষিন্দরের তো তাই হয়েছিল। ওসব ভয়ের কথা অত ভাবতে গেলে চলে না। আর মরণ আমার কোথাও লেখা থাকে যদি—সে ঐ পদ্মার বুকে—মহা সমারোহে আমার মৃত্যু হবে।

পরাশরের এই ভাবপ্রবনতা আমার বেশ লাগিত, পরাশরকে সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম, কাজেই তাহার মুখে তাহার মৃত্যুর কথা আমার মোটেই ভাল লাগিত না। তাই তাহাকে একটা ধমক্ দিয়া বলিলাম, ফের তুই আবার যদি তোর মৃত্যুর কথা তুলবি তো—আমি তোর কোন কথায় কান দেব না।

পরাশর লজ্জিত হইয়া বলিল, আচ্ছা আর কখনও বলবো না, দেখিস্ তুই, কিছুতেই আর বলবো না।

পাঁচদিনও কাটিতে পাইল না। পরাশর আবার ছটফট করিতে আরম্ভ করিল। এ অবস্থায় পরাশরের মুখের দিকে চাহিলেই পরাশরের মনের ভাব আমরা বুঝিতে পারি। পড়াশুনা—কোন কিছুর প্রতিই তাহার আর মন নাই। হোষ্টেলে কেমন যেন সে অন্যমনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। শুধু কয়দিন যাবৎ তাহার মধ্যে এক নূতন পরিবর্ত্তন দেখিতে-

ছিলাম। সময় পাইলেই সে রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'খানি খুলিয়া বসিত এবং তাহারই মধ্যে নিবিড়ভাবে মগ্ন হইয়া যাইত। বৈকালের দিকে সে প্রায়ই আজকাল 'চয়নিকা'খানি লইয়া উত্তরের পুলটার উপর গিয়া বসিত। কাহারও সঙ্গে বড় একটা কথা কহিত না। মুখের ভাব সর্ব্বদাই কেমন যেন থম্‌থমে।

একদিন শেষে পরাশরের জন্য চিন্তান্বিত হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হ্যাঁরে পরাশর, এ ক'দিন কি তোর শরীর মন ভাল না ?

পরাশর দিব্যি একটু হাসিয়া বলিল, কেন—খুব ভালই তো আছি। রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' আমার অনেক দুঃখ ঘুচিয়েছে। কিন্তু হল্লা হৈ চৈ আর আমার ভাল লাগে না! তুই বুঝি ভাবছিস মানব যে,—আবার একদিন আমি পদ্মা দেখতে পালিয়ে যাব ? আবার জ্বর নিয়ে হোষ্টেলে ফিরে আসবো ? তুই আবার আমাকে সেবা করে ভাল ক'রে তুলবি ? না, আর কখনও যাব নারে আমি !

এই কথাবার্ত্তার তিন দিন পরেই সহসা আবার পরাশর কোথায় যে চলিয়া গেল—কেহ আর ভাবিয়া পাইল না। রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা' খানিও হোষ্টেলের কোথাও আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বুঝিলাম, পরাশর সঙ্গে লইয়া গেছে। আবার সকলে সেই আগেকার মত পরাশরের জন্য দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইল, আবার তাহার জন্য খোঁজাখুজি পড়িয়া গেল। অক্ষয়ের কাছে খোঁজ নেওয়া হইল, জানা গেল, তাহাদের জেলে ডিঙিতে এবার সে আর পদ্মা-সন্দর্শনে যায় নাই। কিন্তু অনেক খোঁজ করিয়াও পরাশরের আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। দুইদিন পর্য্যন্ত দেখিয়া হেডমাষ্টার মহাশয় একটি ছাত্রকে বন-মাধুরী গাঁয়ে পরাশরদের বাড়িতে এ দুঃসংবাদ দিতে পাঠাইলেন। কিন্তু সে বন-মাধুরী গাঁয়ে গিয়া পরাশরকে তাহাদের বাড়িতেই দেখিতে পাইল। পরাশর খুব যত্ন করিয়া মৃত্যুঞ্জয়—যে এই

দুঃসংবাদ দিতে গিয়াছিল—তাহাকে সেখানে খাওয়াইল, তারপরে কিছুতেই আর সে হোষ্টেলে ফিরিতে চাহিল না। বলিল, আমি এমনভাবে এই কঠিন শাসনের মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকলে কিছুতেই আর বাঁচবো না। আমি পড়াশুনা ছেড়ে দেব, ও আর আমার ভাল লাগে না। এমনি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে আটক রাখলে—আমি একদিন পাগল হ'য়ে যাব।

পরাশরের অভিভাবক মহাদুর্ভাবনায় পড়িলেন। পরাশরের মা কত করিয়া তাহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু পরাশর কিছুতেই আর হোষ্টেলে ফিরিয়া যাইতে যেন রাজী হয় না। শেষে পরাশরের এক কাকা একরকম যেন পরাশরকে জোর করিয়াই নৌকায় তুলিলেন এবং হোষ্টেলে পৌঁছাইয়া দিয়া হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে পরাশরের জন্য মার্জ্জনা চাহিয়া গেলেন ও জানাইয়া গেলেন যে, এজন্য যেন পরাশরের উপর তেমন কোন শাসন না হয়। পরাশর রবীন্দ্রনাথের 'চয়নিকা'খানি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল, আবার সঙ্গেই লইয়া আসিল।

হেডমাষ্টার মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। কিন্তু পরাশরের করুণ বিষাদক্লিষ্ট মুখের পানে চাহিয়া তাহাকে শাসন করিতে তাঁহার কেমন যেন বাধিল।

কিছুদিন পরাশর কাহারও সঙ্গে মিশিল না, 'চয়নিকা'র মধ্যেই ডুবিয়া রহিল। একা একা তখন তাহার দিন কাটিতেছিল।

একদিন পরাশর আর আমার সঙ্গে কথা না কহিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, মানব, হোষ্টেলের সবাই আমার ওপর চ'টে আছে, নারে? তুইও চটেছিস আমার ওপর? কিন্তু কি মজা দেখ, এসব আমি নিজের ইচ্ছায় কোনোদিন করি নি, কে যেন আমাকে জোর ক'রে এসব করাচ্ছে। আমার ভেতর আর একটা মানুষ যেন সর্ব্বদা গর্জ্জাচ্ছে, ঠিক পদ্মার মতই

তার ভীষণ মূর্ত্তি, তার শাসন আমি কিছুতেই এড়াতে পারি না। সে-ই একদিন আমাকে পাগল ক'রে ছেড়ে দেবে।

পরাশরের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম সে যেন অতিকষ্টে কথাগুলি বলিতেছে। কিন্তু পরাশরকে কোন সান্ত্বনার বাক্য শুনাইতে পারিলাম না, শুধু বলিলাম, একদিন আবার এসব কেটে যাবে।

পরাশর আবার বলিল, উঃ, আমার বুকের ভেতর কি যে জ্বালা—সে শুধু জানি আমি। শীগগিরই আমি বোধ হয় ভীষণ একটা রোগে পড়বো, আর হয়তো কখনও ভাল হ'য়ে উঠবো না! আজ ক'রাত্তির আমি চোখের পাতা পর্য্যন্ত বুজতে পারি নি। সব সময় কেবল মনে হয়েছে, কে যেন আমার কাছে আসবে, পদ্মার সেই অজানা ওপার থেকে কে যেন ডিঙ্গি ভাসিয়েছে —তার সোনার ডিঙ্গি, সে আসছে! আমি তারই জন্যে রাতের পর রাত জেগে কাটাচ্ছি। আমার চোখে ক'রাত্তির একটুও নিদ্রা নেই। এমন হ'লে মানুষ বাঁচে না, মানব, আমিও বাঁচবো না বেশিদিন।

পরাশরকে খুব ধম্‌কাইয়া থামাইয়া দিলাম। এসব আমার ভাল লাগিতেছিল না। পরাশরের কথাগুলি যদিও আমার কাছে খুব নূতন বলিয়া বোধ হইতেছিল, কেমন যেন ওগুলির মানুষকে মুগ্ধ করিবার শক্তি আছে; কিন্তু পরাশরের মৃত্যুর তাহাতে আভাস রহিয়াছে দেখিয়া আর সহ্য করিতেছিলাম না। পরাশরকে সত্যই ভালবাসিয়াছিলাম। তাহার এসব কথা-বার্ত্তা তাই কেমন অসহ্য মনে হইতেছিল। পরাশরের মনের এ অবস্থা দেখিয়া পরাশরকে তাহার অজ্ঞাতে আমি চোখে চোখে রাখিতেছিলাম। করুণাকিঙ্করবাবু ও হেডমাষ্টার মহাশয়ও পরাশরের প্রতি বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কারণ, পরাশর তখন হোষ্টেলে ভীতি জাগাইয়া দিয়াছিল।

আবার একরাত্রে পরাশর পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির

হইল। আমি তাহা টের পাইয়া শয্যায় নিঃশব্দে উঠিয়া বসিলাম। তারপর অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলাম। পরাশরের কোনদিকে কোন খেয়াল ছিল না। সে বরাবর গিয়া উত্তরের পুলটির উপর পা ঝুলাইয়া দিয়া বসিল, তারপরে গুন্ গুন্ করিয়া গান ধরিল। আমি একটা আমগাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইলাম। ক্রমেই আমার কেমন যেন ভয় হইতে লাগিল।—পরাশর সত্যই কি শেষে পাগল হইয়া যাইবে? পরাশরের জন্য সমস্ত অন্তর আমার আজ ডুক্‌রাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তারপরে পরাশরের জন্য আরও ভয় বাড়িতে লাগিল। কেবলই ভাবিতেছিলাম, পরাশর এখন যদি খালের জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে! ওর মনের অবস্থা যা' তাহাতে যেন সকলই সম্ভব। তাড়াতাড়ি ওর কাছে গিয়া পিছন হইতে ওর দুইটি হাত শক্ত করিয়া ধরিলাম। ও কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না, একটুও চমকাইল না। বলিল, আমি জানি, তোরা সর্ব্বদাই আমাকে পাহারা দিচ্ছিস। এমনি ক'রে হোষ্টেল-শুদ্ধ লোক আমাকে দৃষ্টির বন্ধন দিয়ে ঘিরে রেখেছিস। চারিদিকে আমার বন্ধন, কিন্তু বাইরে প'ড়ে আছে আমার মন, সেই সুদূর পদ্মার দিক্-চক্রবালের ঘন নীল রেখাটি ধ'রে ঘুরে মরছে আমার ঘরছাড়া উদাসী মন। পশ্চিমের মাঠে দুপুর রাতে গেলে শুনতে পাবি, সেখানে কেঁদে কেঁদে ফিরছে আমার বিবাগী মন। আমাকে তোরা ধ'রে রাখতে পারিস নি মানব।

তারপরে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, অনেক রাত হয়েছে, চ' ঘরে ফিরে যাই।

পরাশরকে লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। উভয়ে যে-যাহার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার সহজে আর নিদ্রা আসিল না, পরাশরের কথাই ভাবিতেছিলাম। থাকিয়া থাকিয়া পরাশরের দীর্ঘনিশ্বাস যেন শুনিতে পাইতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে পরাশর হঠাৎ তাহার শিয়রের

আলোটি জ্বালিল। তারপরে কখন যেন আমি গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেলাম।

পরদিন ভোরে হোষ্টেলের সকলেই জাগিয়া উঠিল, কিন্তু পরাশর আর ওঠে না। সে বহুদিন পরে যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়াছে। বেলা যখন অনেক বাড়িয়া গেল তখন পরাশরকে ডাকিয়া তুলিলাম। পরাশর বেলায় ঘুম ভাঙ্গায় যেন লজ্জা পাইয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল। মুখে তাহার কেমন যেন একটু সলাজ পরিতৃপ্তির হাসি। বহুদিন পরে আবার পরাশরের মুখে হাসি দেখিয়া মনটা খুসি হইয়া উঠিল।

পরাশরই বেশ একটু হাসিয়া প্রথম কথা কহিল, বলিল, আমার সমস্ত ভাবনা এতদিনে ঘুচে গেছে মানব। আর আমি ভাবিনে কিছু। কাল সারারাত যা' ঘুমিয়েছি—কি বলবো! আমি এতদিন জানতাম না, কাল রাত্তিরে আবিষ্কার করেছি মানব যে, আমিও চমৎকার কবিতা লিখতে পারি! কি সুন্দর কবিতা লিখেছি—তোকে দেখাবো।

পুকুরে চোখ-মুখ ধুইতে গিয়া পরাশর আমাকে আড়ালে ডাকিয়া নিয়া তাহার কবিতা পড়িয়া শুনাইল। পরাশর চমৎকার কবিতা লিখিয়াছে —প্রতি ছত্রে ছত্রে তাহার নিরুদ্ধ অন্তরের কান্না গুমরিয়া মরিতেছে, পশ্চিমের মাঠ, পদ্মার জল-কলতান -- সব যেন সে-কবিতায় মূর্ত্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে। পরাশরকে আনন্দে বুকের মাঝে টানিয়া নিয়া বলিলাম, চমৎকার হয়েছে পরাশর!

পরাশর পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া শুধু বলিল, আমি আমার মুক্তির পথ এতদিনে খুঁজে পেয়েছি—মানব, আমার জন্যে আর কারও কোন ভাবনা রইল না। আমি বেঁচে গেলাম মানব!

কেন ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু পরাশরকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া

ধরিয়া তাহার কথায় সেদিন কাঁদিয়া ফেলিলাম। হয় ত অন্তরের আনন্দ উদ্ধত গৌরবে অন্তরের ব্যথার তারটিও না নাড়িয়া দিয়া আর থাকিতে পারে নাই! *

* এই গল্পটি সাহিত্য-সেবক-সমিতির কোন একটি বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হয় এবং বহু সাহিত্যিকের প্রশংসা অর্জ্জন করে। পরে অনিবার্য্য কারণে গল্পটি "যে বেদনায় ফোটে ফুল" নামে "দেশ"-এর বিশেষ শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এখন পূর্ব্বের নামেই গল্পটি প্রকাশ করা হইল।—লেখক।

বেদিয়া-ছন্দ

জীবনের আচম্‌কা আরম্ভ।

পদ্মার তীরে তীরে, খালের মুখে মুখে, ভাসমান নৌকার বুকে। পদ্মার বুকের উপর দিয়া উড়িয়া চলা পাখীর ঝাঁকের মধ্যেই সে যেন একটি বিরাট শূন্যে সৃষ্টি-ছাড়ার দলে ছন্দহারা সঙ্গিনী। জীবন তখন তরল, জলের মতোই স্বচ্ছ সরল, কিশোরী—কিশোরের চপল খেলায় উদাসিনী শিঞ্জিনী, বাজার কৌতূহলেই শুধু বাজিয়া চলে।

বদিয়া-নৌকা সার বাঁধিয়া চলে খালে খালে। কখনও স্রোতের মুখে, কখনও বিমুখে. দুই পারে কোন পরিচয় রাখিয়া যায় না, কোথাও বাঁধা পড়ে না। আজ যেখানে পরম আত্মীয়, কাল সেখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, অনাত্মীয়। আজ গঞ্জে রাত্রি আসে, কাল গ্রামের মাঝে, পরশু গ্রামের বাহিরে খালের তে-মাথায়, তারপরে হয়তো চিতা-খোলার কাছেই বকুলের তলে। অজানা গন্তব্য, গতি তাই সহজ সুন্দর, ক্লান্তি তাই অচেনা।

ইহারই মাঝে জীবনের প্রত্যেকটি কোমল পাপ্‌ড়ি ফুটিয়া ওঠে একে একে—অকৃত্রিম, সরল, সাধারণ, দাগ পড়ে না তাহাদের কচি কোমল ফুলপাতে।

যামিনী তখন বেদিয়া-বালা।

পাঁচখানি নৌকাই পাশাপাশি চলে। যামিনী সবে বৈঠা ধরিতে শিখিয়াছে। খালের জল ছল্ ছল্ তল্ তল্ শব্দে নৌকার তলে গভীর ব্যথায় মাথা

কোটে। নৌকার বুকে তাহার সমবয়সী সকলে যামিনীর বৈঠা-টানার ভঙ্গী দেখিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠে।

যামিনী রাগ করিয়া বৈঠা তুলিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে। মনে মনে হয়তো ভাবে, কেমন জব্দ সব!

ছইয়ের তলায় গিয়া আত্মগোপন করিয়া সকলকে আরও বেশি জব্দ করার চেষ্টা করে।

ঐ নৌকা হইতে কুর্ণা বলে, যামিনা, তোকে আর রাঁধতে হবে না ভাই। একটু বৈঠা টানতেই বরং শেখ্, তবু কাজে লাগবে।

পর্কা আরও বেশি ফাজিল, সে বলে, আরে কুর্ণা, ছাখ্, ছাখ্, ষ্টীমারটায় বুঝি আগুন ধ'রে গেল!

—কই?

যামিনী আবার নৌকার আগু-গোলুইয়ে আসিয়া বসে।

সবাই আবার খিল্ খিল্ করিয়া এক চোট হাসিয়া লয়। যামিনীর তাহাতে আর চোট লাগে না।

আবার জলের কল-কল্লোল।·····এ-নৌকায় সে-নৌকায় কাজের কথা, নৌকা কোথায় আজ বাঁধা হইবে, বাজারে যাওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, শিয়াল-চেঁচানীর চরটা ভাল, না ঐ ঘোড়া-মারীর খালের মুখটা, না ঐ ষ্টীমার-ঘাটার বাঁধের কাছটা?—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পাশাপাশি পাঁচখানি নৌকাই বাঁধা হয়। চরে নামিয়া ছোটরা খেলে লুকোচুরি, বড়রা খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে। আশে-পাশের চারিদিক খট খট ঝন্-ঝন্, হাসির হর্‌রায়, কথা-বার্ত্তায় মুখর চঞ্চল হইয়া ওঠে। নৌকার আলোগুলি টিপ টিপ্ করিয়া নিবু নিবু হইয়া জ্বলে—যেন মুমূর্ষুর চোখের শেষ জ্যোতিঃ। আকাশে হয়তো তৃতীয়ার একফালি চাঁদ।·····

ফাঁকা ধু-ধু করে বালুচর—না আছে লোকের বাস, না আছে গাছপালা। সহসা যেন জীবন পায়।

ঝোটন যামিনীকে এক রোখা তাড়া দেয়। ও আর পারে না, তখন বসিয়া পড়িয়া কাতর মিনতিভরা চোখে চায়। ঝোটন তা গ্রাহ্যও করে না, তাহাকে ছুঁইয়া দিয়া সোল্লাসে বলিয়া ওঠে, এই, এই—যামিনী চোর।

সবাই সমস্বরে বলে, এই—যামিনী চোর হয়েচে, কেউ ছোঁওয়া দিবি না, সাবধান! আজ ওকে কাঁদিয়ে তবে আমাদের নাম!

যামিনী ছুটিয়া ছুটিয়া হয়রান্।

শেষে ঝোটন বেটপ্‌কা পা পিছলাইয়া পড়িয়া যায় হয়তো। তৃতীয়ার চাঁদ ফিক্ করিয়া হাসে কি না একটু কে জানে!

অচেনা খালের ঠোঁটায় সূর্য্য হঠাৎ মাঝ-গগনে উঠিয়া পড়ে। একে একে ছোট বাঁশের লগিগুলি মাটিতে পুঁতিয়া নৌকাগুলি সার দিয়া তাহাতে বাঁধা হয়। দেখিতে দেখিতে যামিনী, ঝোটন, পর্‌কা, কুর্ণা, কেশর—সব খালের জলে নামিয়া পড়ে। জলে তাহাদের 'নল ডুবানি' খেলা শুরু হয়। তাহাদের খেলায় জল মাতাল হইয়া ওঠে, বাতাস সেখানে মুগ্ধ-বিস্ময়ে কান পাতে, সূর্য্য তাহার ডাগর এক চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকে।

এক ঝাঁক পানকৌড়ি। টুপটাপ ডুব দেয়, ওঠে, হাসে, আবার ডুব। জলে সে কি আলোড়ন!

দূরে দূরে শঙ্খচিল তাহার করুণ-বিলাপে মধ্যাহ্ন-গগনকে মূর্চ্ছিত করিয়া তোলে। খাল-পারের গ্রামের মাঝ হইতে কামারের হাতুড়ির ঘা যেন জলের বুকে আসিয়া ধাক্কা খায়, আবার মিলাইয়া যায়। ওপারে

কাঁসারিদের কাজ চলে, কচাং কচাং···ঝন্ ঝন্···এপার দিয়া রাখাল গরু তাড়াইতে তাড়াইতে গান ধরে। কাজিল ছোঁড়ার গানে কে বা কান দেয়, তবু সে গাহিয়া চলে --

কোন্ ঘাশে যাও রে নাইয়া, কোন ঘাশে যাও ?
আমার ঘাটের রত্ন হেইরা
আঘাটায় আজ বাঁন্ধলা বুঝি নাও ?

দুই তীরের গাঁয়ের বধূরা কলসী কাঁখে করিয়া স্নান সারিতে আসে। আবক্ষ জলে ডুবাইয়া সংসারের দুঃখ-দৈন্যের করুণ কাহিনী বলে। সহসা মনে পড়ে বেলা আর কই ? ত্রস্তে কাজ সারিয়া উঠিয়া যায়। কাঁখের ভরা কলস ছল্ ছল্ করে, ভিজা বসন সলজ্জ গতিতে আরও বাধা দেয়, ভিজা পায়ের চিহ্ন পথে আঁকিয়া আঁকিয়া তাহারা চলিয়া যায়।

গাঁয়ের শীর্ণ কুকুরটা ধুঁকিতে ধুঁকিতে আসিয়া জলের কিনারায় দাঁড়ায়। অদূরে তাহার সাথীটি নীরবে প্রতীক্ষা করে। আবার মাঠের পথে তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়।

অদূরে কৃষাণ পাট ধুইয়া ধুইয়া তাহার নৌকা বোঝাই করে।

এমনই চাঞ্চল্য ! তবু তীরের কানাচে বসিয়া কথিত সাধু-বক নিবিড় ধ্যানে মগ্ন—চোখের পাতাটি পর্য্যন্ত পড়ে না।

এত·····কিন্তু মধ্যাহ্ন বিষণ্ণ-ব্যথায় মূর্চ্ছিত !

যামিনী হঠাৎ খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়াই আবার নীরব হইয়া যায়। চোখে মুখে তাহার রঙ্ ধরে। বড় হঠাৎ !···নিজেই চমকিয়া ওঠে নিজের পরিবর্ত্তনে। নূতন বিস্ময়, প্রথম পরিচয়, ··সে যেন আচ্ছন্ন হইয়া আসে কি এক নবীনতম আবেশে। অদূরে দাঁড়াইয়া ঝোটন তাহার রঙীন

ঠোঁটের কম্পন লক্ষ্য করিয়া অস্পষ্ট কৌতুকে হাসে। পর্‌কা ও কুর্ণা বা কেশর ইহার কোন সন্ধানই রাখে না।

তাহারা বলে, চোর কে ? যামিনী ?

ঝোটনও আর দূরে পালায় না, যামিনীও আর তাড়া দেয় না।

পর্‌কা বলে, কি হ'ল রে তোর যামিনী ? চোর দিবি না ?

যামিনী নীরবে দাঁড়াইয়া থাকে।

কুর্ণা বলে, তবে ঝোটনকেই চোর দিতে হবে। ও আর খেলবে না।

যামিনী তাড়াতাড়ি বলে, ও কেন চোর দেবে ? আমি কি দিতে জানি না ?

যামিনী তাড়া করে। ঝোটন টুপ্‌ করিয়া ডুব দেয়, কিন্তু একটুও নড়ে না। যামিনী হাতের কাছে পাইয়াও তাহাকে ছোঁয় না। পর্‌কা, কুর্ণা দূরে দূরে থাকে। তাহাদেরই ধরার চেষ্টা করে। কেশর যামিনীর পিছু পিছু থাকে, স্বেচ্ছায় বহুবার ছোঁওয়া দিতে চায়, যামিনী তাহার অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করে। তবু সে যামিনীর পিছু ছাড়ে না। ঝোটন একসময় ডুব দিয়া ঠিক যামিনীর কাছে আসিয়াই ওঠে, উঠিয়াই বেকুবের মতো হাসে। যামিনী থপ্‌ করিয়া তাহাকে ছুঁইয়া দেয়, কিন্তু হাসিতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হয়।

আবার ঝোটন চোর। যামিনীর সর্ব্বশরীরে কি এক অপরিচিত অননুভূতপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়া ওঠে। সে দূরে—সকলের দৃষ্টির বাহিরে গিয়া যেন দাঁড়াইতে চায়।

ঝোটন কিছুক্ষণ তাহাকে এড়াইয়া চলে, ইহাকে উহাকে না ছুঁইবার জন্য তাড়া করে—ধর-ধর হয়—হঠাৎ ডুব দিয়া অন্য এক দিকে গিয়া ওঠে, খিল্‌ খিল্‌ করিয়া হাসিয়া ফেলে—যেন নিজের বোকামিকে সে বিদ্রূপ করিতে চায়।

যমিনীর কাছে আসিয়াই ডুব দেয়, যামিনীও একটা না-পুলক না-সভয়

গোছের খ্যিক্-খ্যিক্ আওয়াজ করিয়া ডুব দেয়, কিন্তু এবার আর ঝোটন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হয় না।

ঝোটন উঠিয়াই বলে, কোথায় পালাবে শুনি। ইঃ, পালালেই হ'ল আর কি! এই— যামিনীর কাছে নল, ছুঁয়ে দিয়েছি।

যামিনী উঠিয়াই চোখে হাত চাপা দেয়, বলে, খেলব না, ও এমন চোখে আঙুল দিয়ে দিলে, উঃ—

সকলেই কাছে আসে। ঝোটন তাহার হাতটা টানিয়া চোখের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া বলে, কই, দেখি?

যামিনী অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া নিয়া বলে, না, তোকে আর দেখ্‌তে হবে না, যাঃ!

ঝোটন মিট্ করিয়া একটু হাসিয়া বলে, ইঃ ভারি!

আস্তে আস্তে সে তীরে উঠিয়া যায়।

খেলার তাল কাটা যায়, আর সেখানেই সে-দিনের মতো শেষ হয়।

আহারান্তে সকলেই বাহির হইয়া পড়ে দল বাঁধিয়া গাঁয়ের এ-পথে সে পথে। কাহারও সঙ্গে কাঁচের রঙীন্ চুড়ি, শাঁখা, রুলি, কাহারও সঙ্গে রঙ্‌দার পুতুল ও খেল্‌না, কাহারও সঙ্গে বেতের নানা রকম বোনা জিনিসপত্র, কাহারও সঙ্গে কোমর-বেদনার দাওয়াই, বশীকরণের শিকড়, ইত্যাদি কত কিছু বাড়ি বাড়ি তাহারা ফিরি করিয়া ফেরে।

যামিনীকে অনেক সাধাসাধি করিয়া পরুকা, কুর্ণা ও কেশর ব্যর্থ হইয়া বড়দের সঙ্গ নেয়, তারপর গ্রামের মাঝে চলিয়া যায়।

ঝোটন ছইয়ের নিচে ঘুমের ভান করিয়া পড়িয়া থাকে। সবাই চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া আস্তে আস্তে নৌকা হইতে নামিয়া আসিয়া বলে, তুই গেলি না যে ওদের সঙ্গে যামিনী?

—না, ঘুম পাচ্ছে।

ঝোটন ফিক্ করিয়া হাসিয়া বলে, আয় বোকা মেয়ে, চল, এ গাঁ-টা কেমন দেখে আসি।

যামিনীর চোখে আর ঘুম থাকে না। ঝোটন আর যামিনী একটা নূতন পথ বাছিয়া লইয়া চলিতে থাকে।

যামিনী বলে, ওদের আগে কিন্তু ফেরা চাই।

ঝোটন বলে, না, সন্ধ্যের আগে কিছুতেই ফিরতে পারব না।

—না, ওরা কি ভাববে?

—তা' ভাবুক, ভারি ব'য়েই গেল।

যামিনীর মুখ-চোখ কেমন লাল হইয়া ওঠে। বনপথে একটা গাছের ছায়ায় বসিয়া পড়িয়া বলে, না, আর আমি চলতে পারি না।

—তবে এলি কেন?—বলিয়া ঝোটন তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করে।

যামিনী কিছুতেই যখন ওঠে না, তখন ঝোটন বলে, না উঠলে কিন্তু চোখে ফের আঙুল দিয়ে দেব!

যামিনী ভাবে, জলতলে আর বনতলে অনেক তফাৎ। বলে, কই, দিয়ে ছাখ দিকি?

ঝোটন মাটিতে একটা জানু রাখিয়া নত হইয়া দু'হাত দিয়া যামিনীর মুখটা তুলিয়া ধরিয়া ত্রস্তে তাহার ঠোঁটের উপর নিজের কম্পিত ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া স্তব্ধ হইয়া যায়।

কেমন, হ'ল তো?

যমিনী বলে, না।

ঝোটন এবার তাহার দুই ঠোঁটের পাতা দিয়া যামিনীর নিচেকার ঠোঁটের পুরু পাতাটা চাপিয়া ধরিয়া নিবিড়ভাবে নিপীড়ন করিতে থাকে। যামিনী

পুলক-ব্যথায় কাঁপিতে কাঁপিতে ঝোটনের মাথাটা দু'বাহুর বেষ্টনে বৃথাই চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে প্রয়াস পায়। খেলাচ্ছলে আজ যে কথার সে প্রথম আভাস পাইয়াছে, তাহার সমগ্র রূপ সে যেন চায় ঝোটনের ওষ্ঠের স্পর্শে চিনিয়া লইতে।

ঝোটন একসময় মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখে, যামিনীর ঠোঁটের প্রান্তে রক্ত যেন ঝলকাইয়া উঠিয়াছে! চমকিয়া উঠিয়া বলে, এই, এই, কেশর আসচে ছাখ।

যামিনী ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়ায়। ঝোটন হাসিয়া ফেলিয়া বলে, কেমন ঠকিয়েছি?

যামিনীর রাগ হয় না এ ফাঁকিতে, কিন্তু ঝোটন কোথায় যেন তাহাকে আর একটু ফাঁকি দিয়াছে—সেই কথাই সে ভাবে।

দু'জনে পাশাপাশি চলিতে থাকে কিন্তু বনপথ আর তাহাদের আলাপ-গুঞ্জনে মুখর হইয়া ওঠে না।

ঝোটনের কাছে এ নীরবতা অসহ্য বোধ হয়, বলে, বোবা হ'য়ে গেলি না কি?

যামিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া তাহার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলে, ধেৎ, ফাজিল কোথাকার!

বনের পাখীটা উচ্চকিত হইয়া ডাকিয়া ওঠে।

সাঁঝের আঁধার ঘনাইয়া আসে।

বনপথ ছাড়াইয়া আসিয়া ঝোটন বলে, দেখি তোর মুখ যামিনী!

যামিনী বলে—যাঃ।

—যাঃ না, কেশর যদি বুঝতে পারে, তবেই—মুখ টিপিয়া হাসে।

—ব'য়েই গেল!

যামিনী কিন্তু মহা ভাবনায় পড়ে। ঝোটনের অলক্ষ্যে জিব্ দিয়া চাটিয়া

চাটিয়া ঠোঁটের দাগটা মুছিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। মুখ তাহার আরও লাল হইয়া ওঠে।

তাহারা নৌকার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু তাহাদের আগমনে কেহই তেমন বিচলিত হয় না।

পর্‌কা বলে, এই যে—

কেশর তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরে। ঝোটন অমনি বোঝে যে, কেশর কথা না বলিয়া তাহাকে জব্দ করিতে চায়। একটু মুক হাসি হাসিয়া নৌকায় গিয়া উঠিয়া বসে। ওপারের নৌকার দীপগুলির প্রতি বিস্ময়-স্তিমিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া যামিনী সেইখানেই দাঁড়াইয়া থাকে।

যামিনীর যৌবন সহসা জীবন পায়।

কেশর আপনার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে ঝোটনের প্রতি কথায়, কাজে, খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘোষণা করিয়া বসে। ঝোটন তথাপি তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়াই চলে। পর্‌কা এবং কুর্ণাও ঝোটনের বিরুদ্ধতা করে, কিন্তু কেশরের দৃষ্টি তাহারা কিছুতেই আকর্ষণ করিতে পারে না। বেদিয়া-নৌকায় এই যে মহাযুদ্ধের নীরব অভিনয় চলে যামিনীকে ঘিরিয়া—এ কথা আভাসে ইঙ্গিতেও তাহাদের পাঁচজনের বাহিরে আর কেহই জানিতে পারে না।

যামিনীর উদ্দামতা কিন্তু বাধা পায়।

নদী-কূলে শ্মশানের কোলে সেদিন নৌকা লাগিয়াছে

সাঝের অন্ধকারে ওপার হারাইয়া গিয়াছে। শুধু তীরে তীরে দু'একটি নৌকার আলো তাহাদের ক্ষীণ দুর্ব্বল প্রচেষ্টায় অন্ধকারের হাত হইতে ও-পারকে এ-পারের দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চায়। কিন্তু কতটুকু তাহাদের শক্তি!

কেশর নৌকা হইতে লাফাইয়া তীরে নামিয়া বলে,আয়, কে যাবি আমার সঙ্গে?

পর্‌কা ও কুর্ণা সঙ্গে সঙ্গে নৌকা হইতে নামে, যামিনী বলে, তুই যাবি না ঝোটন?

—না, ওদের সঙ্গে যাব না।

যামিনীর হঠাৎ কি মনে হয়, বলে, হ্যাঁ, কেশরের সঙ্গেই যেতে হবে।

—না, কিছুতেই না। তোর ইচ্ছে হয়, যা না, কে তোকে বারণ করেছে?

—যাব তো। এই চল্‌লাম। বলিয়া যামিনী হাত বাড়াইয়া দেয় কেশরের দিকে। কেশর জয়ের গৌরবে যামিনীর হাতটা ধরিয়া অনায়াসেই তাহাকে উঁচু তীরে তুলিয়া লয়।

ঝোটন সেদিকে একবার চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লয়। যামিনী পিছু ফিরিয়া আর চায় না. কেশরের সঙ্গে আগাইয়া চলে। পর্‌কা ও কুর্ণা কিছুদূর গিয়াই আবার থামে।

পর্‌কা বলে, কুর্ণা, চল, ঝোটনকে ফের ডেকে আনি।

ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঝোটন সেখানে নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানে, তাহাদের পিছু পিছু সে গিয়াছে। কিন্তু তাহার আর সন্ধান মেলে না। কেশর আর যামিনীর সন্ধানে যাওয়াও তখন বৃথা। শ্মশান ছাড়াইয়া নদী-তীরের একটা গাছের প্রকাণ্ড শিকড়ের উপরে দু'জনে আসিয়া বসে—কেশর ও যামিনী। কেশর জয়ের আনন্দে ভাষা খুঁজিয়া পায় না। যামিনী ঝোটনের কথাই ভাবে।

দু'জনেই মূক হইয়া থাকে।

রন্ধ্রহীন অন্ধকার, নিবিড় নিস্তব্ধ দুই পার—মাঝে ভাঙন-মুখর পদ্মার সুগভীর দীর্ঘশ্বাস—নিস্তব্ধতাকে আরও প্রাণময় করিয়া তোলে।

মানুষের পায়ের শব্দে তাহারা চমকিয়া ফিরিয়া চায়। ঝোটন নীরবে যামিনীর হাত ধরিয়া বলে, উঠে আয় শীগগির।

যামিনী কেমন ভয়ে ভয়ে উঠিয়া দাঁড়ায়। ঝোটনের চোখ দুইটি সেই অন্ধকারেও যেন জ্বলিতে থাকে।

কেশর ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খপ করিয়া ঝোটনের বাঁ হাতটা চাপিয়া ধরিয়া বলে, ভাল হ'চ্ছে না কিন্তু ঝোটন, সাবধান!

ঝোটন নিরুত্তরে একটা হেঁচকা টান মারিয়া নিজের হাতটা অনায়াসেই ছাড়াইয়া লইয়া উদ্ধত অবজ্ঞায় হাসে।

কেশর ক্ষিপ্তের মত আবার তাহার হাতটা চাপিয়া ধরে। ঝোটন যামিনীর হাতটা ছাড়িয়া দিয়া কেশরকে এক ধাক্কায় সরাইয়া দিয়া বলে, ভাল হ'চ্ছে কি না, ছাখ্ এইবার।

কেশর লজ্জায়, অপমানে মরিয়া হইয়া ঝোটনকে আক্রমণ করে। ঝোটন ঘুষির পর ঘুষিতে তাহাকে সেখানে ক্লান্ত, আহত করিয়া বসাইয়া দিয়া মূক-শঙ্কান্বিতা যামিনীর হাত ধরিয়া চলিয়া আসে। যামিনী কিন্তু একটা কথাও বলিতে পারে না।

পরদিন সকালে যামিনী কেশরের মুখের দিকে চাহিয়া ভীষণ চমকিয়া ওঠে। কেশর যে কাল রাত্রে কখন ফিরিয়াছে, তাহাও সে জানে না। তাহার ঐ কপালের ক্ষতের ইতিহাস হয়তো এখনও কেহই জানে না। হায়! সে যদি সকলের ঘুম ভাঙার আগেই কেশরের কপাল হইতে ঐ দাগ মুছিয়া ফেলিতে পারিত! ও যেন তাহারই কলঙ্কের দাগ! একটা হতাশ করুণ

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আগাইয়া যায়, বলে, কেশর, ও কি ! কেটে গেছে বুঝি ?

কেশর হাত দিয়া সে ক্ষত-স্থানটা চাপিয়া ধরিয়া বলে, না, কিছুই তো হয় নি।

ঝোটন নৌকার পাটাতনের উপর দুই কনুইয়ে ভর রাখিয়া করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া পশ্চাতে পা ছড়াইয়া দিয়া কেমন নির্ব্বিকার ভাবে তাহাদের দিকে চাহিয়া থাকে।

যামিনীর সেদিকে চোখ পড়িতেই ঝোটনের অধরে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা ফুটিয়া ওঠে। যামিনী চমকিয়া উঠিয়া দূরে সরিয়া যায়।

ওর সে কি নিষ্ঠুর চাহনি !

অকারণে হাসির হর্‌রা আর ওঠে না। খেলা আর জমে না। কাজের বাহিরের দুনিয়াটার সঙ্গে যেন তাহাদের পরিচয় ঘটে নাই— এমনই। দুর্ব্বার যৌবন, সংযম-কঠিন লালসা, উচ্ছৃঙ্খল স্বপ্ন সাধ···এ কি মূক বিস্ময়ে শুধু চাহিয়া থাকা চলে ? যামিনী ব্যথা পায়। ইচ্ছা হয়, এ নীরবতা একটা অট্ট-হাসির আঘাতে ভাঙিয়া টুক্‌রা টুকরা করিয়া ফেলিয়া একটা বীভৎস উন্মত্ততা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু শক্তি তাহার সীমাবদ্ধ। যদি কেউ পারে তো সে একমাত্র ঝোটনই।

ঝোটন যেন তাহা বুঝিয়াই আরও বেশি নির্ম্মম হইয়া উঠিয়াছে।

যামিনী ঝোটনের দিকে চোখ পড়িতেই অকারণে একটু হাসে, কিন্তু ঝোটনের সাড়া মেলে না। ওখানে প্রাণ আছে বলিয়া যামিনী আর বিশ্বাস করিতেই পারে না। কিন্তু কেশরের মাঝে সাড়া জাগাইবার চেষ্টা করিতেও তাহার সাহসে কুলায় না।

পব্‌কা এবং কুর্ণার কাছেও কোন সহানুভূতি মেলে না।

জীবনের সমস্ত আনন্দ যেন তাহার চুরি করিয়া ঝোটন নিজেই দেউলিয়া হইয়া বসিয়া আছে—এমনই মনে হয়।

ভোরের অল্পই বাকী।

দূরে নদীবক্ষের ষ্টীমারের কর্কশ বাঁশী শুনিয়া যামিনীর ঘুম ভাঙ্গে।

নদীর মুখের খাল চওড়া নেহাৎ মন্দ নয়। ও পারের কিছুই আর চোখে পড়ে না। এ পারটা আবছায়া। দু'একটা নৌকার আলো তখনও জ্বলে।

যামিনী জলের পানে দৃষ্টি ফেলিয়া বসিয়া থাকে। জ'লো-হাওয়ায় কেমন শীত শীত করে, কাপড়টা ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লয়। তাহার মনে হয়, ঝোটনও যেন এমনই তাহার মতো উঠিয়া বসিয়া আছে। ইচ্ছা হয়, ডাকিয়া বলে, ঝোটন, জ'লো হাওয়ায় শীত করচে না তোর?

পাশের নৌকাটা দুলিয়া ওঠে, অস্পষ্ট ছায়ার মতো কে যেন তাহা হইতে ডাঙ্গায় নামে। যামিনীর মন একটা অকারণ পুলকে ছাইয়া যায়। যামিনী সেদিকে চাহিয়া চাহিয়া ঠিক করে, ও আর কেউ না—ঝোটন। তাহার ছায়াও যেন আর সে ভুল করিতে পারে না—এমনই যামিনীর বিশ্বাস।

ঝোটন জলের কাছে বসিয়া মুখ ধুইয়া চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টি ফেলিয়া পাড়ের দিকে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেই যামিনী তড়াক্ করিয়া নৌকা হইতে ডাঙায় লাফাইয়া পড়ে—ঝোটনকে জানিতে না দিয়াই সে তাহার পিছু লয়।

ঝোটন পথের পাশের প্রকাণ্ড গাছের পতিত গুঁড়িটার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়! একটা পা তাহার উপর তুলিয়া দিয়া সেই জানুর উপর একটা হাত রাখিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন দেখিতে চেষ্টা করে।

যামিনী কাছেই একটা গাছের আড়ালে আসিয়া দাঁড়ায়। ঝোটন অবিকল

অবস্থায় তেমনই আনত হইয়া থাকে। যামিনীর অল্পক্ষণেই কেমন অসহ্য বোধ হয়। পা যথাসাধ্য মাটির সঙ্গে টিপিয়া টিপিয়া সে এক নিঃশ্বাসে ঝোটনের কাছে আগাইয়া আসিয়া তাহার আনত-মস্তক দুই হাতে নিজের বুকের কাছে তুলিয়া নিয়া পাগলের মতো তাহার চোখে মুখে যেন দারুণ আক্রোশে ঘন-চুম্বন আঁকিয়া দিয়া বলে, কেমন জব্দ!

ঝোটন একবার চোখ তুলিয়াই তাহা নত করে, যামিনী তাহাকে মুক্তি দিতেই সে গাছের গুঁড়িটার উপরেই আস্তে বসিয়া পড়ে। একটা কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হয় না। কেমন একরকম অর্থহীন দৃষ্টি তুলিয়া চাহিয়া থাকে।

যামিনী মাটিতেই দুই জানু পাতিয়া ঝোটনের উন্নত দুই জানুর উপর দুই করতল ন্যস্ত করিয়া তাহার মুখের দিকে কাতর দৃষ্টি তুলিয়া বলে, ঝোটন, আমার কি দোষ বল্ তো?

ঝোটন আস্তে যামিনীর হাত দু'খানা ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া নিজের হাত সেখানে রাখিয়া তেমনই নীরব হইয়া থাকে।

যামিনী দুই ওষ্ঠ-প্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে পেষণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে চেষ্টা করে হয়তো। ঝোটনের হাত দু'খানা ক্ষিপ্ত আবেগে চাপিয়া ধরে। যামিনীর চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়, কিন্তু ঝোটনের দিকে আর সে ফিরিয়াও চায় না—সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলে।

ঝোটন নীরবে একটু হাসিয়া আবার পূর্ব্ব স্থানেই বসিয়া যামিনীর গতির বিপরীত দিকে মুখ করে। সে জানে, আবার ও আসিল বলিয়া। মনে মনে বলে, এবার ওকে আর ফেরাবো না। আহা!

ভোরের আলো সহসা অন্ধকারের ঘোম্‌টা ঘুচাইয়া ফেলে।

বেলা ক্রমেই বাড়িয়া চলে।

যামিনী তবু ফেরে না। ঝোটনের কেমন ভয় হয়। কাহাকেও কিছু না. জানাইয়া তাহার সন্ধানে একাকী বাহির হইয়া পড়ে। আবার ফিরিয়া আসে। যামিনীর সন্ধান কিছু মেলে না।

বৃদ্ধ বেদিয়া খুর্‌শান্ বলে, কই, মেয়েটাকে তো আজ আর দেখছি না। ও গেল কোথায় ?

বৃদ্ধের কথায় সকলেরই খেয়াল হয়, বলে, তাই তো, ওকে তো আজ আর দেখছি না।

ঝোটন, কেশর, পর্‌কা ও কুর্ণা, এমন কি বৃদ্ধ খুর্‌শানও তাহার খোঁজে বাহির হইয়া যায়। একে একে সকলেই ফিরিয়া আসে, কিন্তু যামিনীর কোন সন্ধানই কেহ দিতে পারে না।

একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

বৃদ্ধ খুর্‌শান্ সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানে, সকাল হইতেই আজ কেহ তাহাকে দেখে নাই। ঝোটন কিন্তু কোন কথাই বলে না।

আবার দলে দলে বেদিয়া-দল চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া পড়ে।

এক দিন, দুই দিন, তিন দিন করিয়া সাত দিন কাটিয়া গেল। যামিনীর কোন সন্ধানই মিলিল না।

বৃদ্ধ খুর্‌শান্ বলে, ওকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম একদিন জলের ধারেই, কোন্ গাঁয়ের কাছে তা' আজ আর মনেও পড়ে না, আবার খোয়া গেল। বলি, যার কপালে কেউ রইলো না, তার কপালে কি আর ও থাকে !

বৃদ্ধ খুর্‌শান্ বৃথাই ঊর্দ্ধে ক্ষীণ দৃষ্টি তুলিয়া চায়—সেখানে কোন সান্ত্বনাই মেলে না।

ঝোটন সকলের চোখের অন্তরালে নিজের চোখ দু'টি লুকাইতে চেষ্টা করে। অশ্রু টল্-মল্ করে সে চোখেও। সে যদি চীৎকার

করিয়া বলিতে পারিত—যামিনী ফিরে আয়, ফিরে আয়, আর কখনও তোকে ফেরাবো না। তবে সে যেন বাঁচিয়া যাইত।

পাঁচখানি নৌকা আবার বেদিয়া-দল জলে ভাসায়—একখানি বৈঠা তোলা থাকে এই মাত্র। ঝোটনের বৈঠারও জোর আগের মতো আর নাই, তাহা বোঝে।

ধূমল বহ্নি

আমার নূতন রুম-মেটের নাম নিরুপম নন্দী। নিরুপম প্রথম যেদিন এই মেসে আসে সেদিনই সে সকলের দৃষ্টি অতি সহজেই আকর্ষণ করিয়াছিল। নিরুপম সুপুরুষ।—তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার রূপটাই শুধু যে লোকের চোখে পড়িল, তাহা নয়, তাহার কথা বলার অনাগ্রহ দেখিয়াও সকলে বিস্মিত হইল।

মেসের আরও ঘর খালি ছিল, কিন্তু নিরুপম সব দেখিয়া শুনিয়া আমার ঘরটাই কেন জানি পছন্দ করিয়া ফেলিল। নিরুপমকে পরে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এত ঘর খালি থাকিতে সে আমার ঘরটাই পছন্দ করিল কেন? নিরুপম উত্তরে বলিয়াছিল, আমি শৃঙ্খলা খুব ভালবাসি, কিন্তু নিজে আমি উচ্ছৃঙ্খলের চরম, তোকে দেখেই আমার কেমন সাবধানী ব'লে ধারণা হ'ল, সেইজন্যেই তোর রুম-মেট্ হ'লাম।

নিরুপম সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে বিস্মিত করিয়া দিল তখনই যখন দেখিলাম যে, মাস তিনেক কলেজ হইয়া যাওয়ার পরেও সে একখানিও পাঠ্যপুস্তক কিনিল না এবং একদিনের জন্যও আমার একখানি বই চাহিয়া তাহাতে কি আছে দেখিবার আগ্রহও প্রকাশ করিল না। লোক পরম্পরায় আরও জানিয়াছিলাম যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইংরাজি ও বাংলাতে নিরুপম প্রথম হইয়াছে,—অঙ্কে কোনারকমে হয়তো ৩০ পাইয়া পাশ করিয়াছে। তথাপি সে যে কেন আই-এস-সি পড়িতে আসিয়াছিল তাহা ভাবিয়া পাই না। একদিন এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া উত্তয় পাইয়াছিলাম, ও দুইই এক কথা—যে পড়বে সে বিচার ক'রে

আই-এ কিংবা আই-এস-সি নেবে, আর যে পড়বে না সে কেন অত মাথা ঘামাতে যাবে, তার পক্ষে দুইই সমান, একটা নিলেই হ'ল ?

নিরুপমকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তবেই সে আমার কথার উত্তর দেয়, কিন্তু নিজে হইতে কখনও কিছুই বলে না। মেসের আর কাহারও সঙ্গে সে একদিনের জন্যেও কথা কহে নাই। এমনই করিয়া অল্পদিনেই সে মেসের ছাত্রদের সবার আলোচ্য বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

অল্প কয়েক দিনেই বুঝিলাম যে, নিরুপমের যদি কিছুমাত্র আসক্তি কোন কিছুরই প্রতি থাকে তো সে চায়ের প্রতি, কিন্তু চায়ের সাজ-সরঞ্জাম তাহার নিজের কিছু ছিল না, এমন কি, কোনও রেষ্টুরেণ্টে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহও কোনদিনই তাহার দেখি নাই। চা পাইলে সে খুশি হয়, না পাইলে কাতর হয় বলিয়াও তো মনে হয় না। রোজ ভোরে উঠিয়া দুই পেয়ালা চা করিয়া নিরুপমকে ডাকিয়া তুলিতাম। নিরুপম উঠিয়া চোখে মুখে একটু জল ছিটাইয়া আসিয়া বলিত, কাল রাত্রে একটুও ঘুমুতে পারি নি। আঃ, চা পেয়ে বেঁচে গেলাম !

রোজই তাহার এই এক কথা।

এরূপ রোজ রাত্রে ঘুম না হওয়ার কারণ কিছু ভাবিয়া পাই না ; রোজই ভাবি, তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিব, কিন্তু কোনদিনই আর তাহা হইয়া উঠে না। ভোরবেলা তাহাকে দেখিলে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, রাত্রে সে না ঘুমাইয়া কাটাইয়াছে।

দুইদিন পরেই মধ্যরাত্রে সহসা কেন জানি ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া দেখি, ঘরের আলো জ্বলিতেছে, আর নিরুপম বালিশ বুকে চাপিয়া বাঁ

হাতের করতলের উপর কপাল ন্যস্ত করিয়া ডান হাতে ধরা পেন্সিলটার অগ্রভাগ দাঁত দিয়া অতি উগ্রভাগে চাপিয়া ধরিয়া আছে, আর তাহার সম্মুখে বিন্যস্ত রহিয়াছে একখানি দু'পয়সা দামের এক্সারসাইজ বুক। বুঝিলাম, সে কিছু লিখিতেছে। কিন্তু নিরুপম এত রাত জাগিয়া কি যে লিখিতে পারে তাহা কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিলাম না।

শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, ওঃ এই জন্যেই রাত্রে ঘুম হয় না, না?

ও কি হ'চ্ছে শুনি?

নিরুপম চমকাইয়া উঠিয়া বসিয়া খাতাটা বন্ধ করিয়া একটু হাসিল। তারপরে বলিল, না, ও কিছু না। ঘুম পাচ্ছিল না ব'লেই—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বলিলাম, ও, তাই বুঝি প্রেম পত্র লেখা হচ্ছিলো?

নিরুপম লজ্জিত হইয়া বলিল, দূর বোকা! এরকম বাজে কাগজে বুঝি কেউ আবার প্রেম-পত্র লেখে!

উত্তরে বলিলাম, যার ভাল কাগজ কিনে আনায় আলিস্যি থাকে সে আর করবে কি! ওতো তবু ভাল, ঠোঙার কাগজেই কত লোক কাজ চালায়।

নিরুপম বলিল, সে কথা সত্যি। উঠে আয় এখানে, তোকে দেখাব—কত প্রেম-পত্র এ-পর্য্যন্ত রাত জেগে জেগে লিখেছি।

রাত অনেক হইয়াছিল সত্য, ঘুমের ঘোর তখনও ভাল করিয়া কাটে নাই, তথাপি নিরুপমের সে ডাক উপেক্ষা করিতে পারিলাম না।

নিরুপমের পাশে গিয়া বসিতে সে অতি শান্ত সমাহিতের মত তাহার রাতের পর রাত জাগিয়া লেখা কবিতাগুলি একটির পর একটি পড়িয়া চলিল। আমার বিস্ময়ের আর সীমা ছিল না। নিরুপম কিন্তু পড়িয়াই চলিয়াছিল। আমার ভাল-লাগা না-লাগার প্রতি সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি তাহার পঠন-ভঙ্গী, কণ্ঠ-লালিত্য ও দরদ দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ

হইয়া গিয়াছিলাম, সর্ব্বোপরি তাহার কবিতার ভাব-সম্পদ ও ছন্দ-বিলাস আমাকে নির্ব্বাক করিয়া দিয়াছিল। নিরুপম যে এত বড় গুণী তাহা কোনদিনই ভাবি নাই। তাহার কবি-প্রতিভা আমাকে চমৎকৃত করিল। এতদিনে, তাহার দুনিয়ার প্রতি এই যে বিরাট বৈরাগ্য তাহার যেন একটা অর্থ খুঁজিয়া পাইলাম।

বলিলাম, তুই যে এত বড় সম্পদের অধিকারী তা এতদিন জানাস্ নি কেন? প্রেম পত্রতো এর কাছে অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিরুপম, কিন্তু কাব্য-লক্ষ্মী এত অপমান সইলে বাঁচি। একটা কলমও কি তোর জোটে না? আর খাতার তোর যা ছিরি! তুই যে কি মানুষ নিরুপম!

নিরুপম হাসিয়া বলিল, কাগজ আর কলম দিয়েই কি কাব্য-লক্ষ্মীর মান রাখা যায় রে? কাব্য-লক্ষ্মীর মান যদি কোন কবি রেখেই থাকে তো সে আমি।

নিরুপমের কথার অর্থ ঠিক ধরিতে না পারিয়াও বলিলাম, সে কথা অস্বীকার করতে পারি না। আর একথাও না বলে পারি না যে, কাব্য-লক্ষ্মীর যত দরদ যেন তোদের মত সব হতভাগাদের ওপরেই।

সে হাসিতে লাগিল। তারপরে বলিলাম, মাসে একশো টাকার যে ইন্‌সিওর তোর নামে আসে তা দিয়ে তুই কি করিস শুনি? একটা কলম আর ভাল খাতা কি তা দিয়ে কেনা যায় না? এ অমূল্য সম্পদের প্রতি তোর কি অসাধারণ অনাদর, অমন সুন্দর সব কবিতা—কোনো মাসিকে পাঠাস না কেন?

সহসা নিরুপম যেন একটু ব্যথিত হইয়া মুখ নামাইল। কিছুক্ষণ পরে সে আবার মুখ তুলিয়া বলিল, আমার কবিতা সাধারণের জন্যে নয়—ও আমার একান্ত নিজস্ব বস্তু। ছাপার অক্ষরে আমি আমার নিজের কবিতা দেখলে হয়তো নিজেই আঁৎকে উঠবো—তাই ছাপাতে সাহস পাই না।

বলিয়া নিরুপম সহসা আমার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া আবার বলিল,

বল্, আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে কখনও কাউকে আমার কবিতার কথা ভুলেও বল্‌বি না। বিস্মিত হইয়া বলিলাম, না, এমন কথা আমি কখনও দিতে পারি না। কথা হয়তো দেবো, কিন্তু রাখতে পারব ব'লে আমার নিজেরই ভরসা হয় না। এ আমি প্রকাশ না করে কিছুতেই থাকতে পারবো না।

নিরুপম হঠাৎ ভীত হইয়া উঠিয়া আমার হাত আরও নিবিড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, শৈবাল, মানুষকে বিশ্বাস করা আমার স্বভাব নয়। তবু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কেন জানি মানুষকে বিশ্বাস না ক'রেও পারি না। তোকে বিশ্বাস করেচি যখন তখন যে ঠকতেই হবে সে আমি জানি। তবু আমার একমাত্র অনুরোধ—রাখতে চেষ্টা অন্ততঃ করিস।

আমার মুখ হইতে ইহা যে সজ্ঞানে কখনও প্রকাশ পাইবে না এমন অভয় দিয়া তাহাকে তাহার আরও কবিতা শুনাইতে বলিলাম। নিরুপম আবার পড়িয়া চলিল। রাত তখন তিনটার কাছাকাছি।

কয়েকদিন যাবৎ নিরুপমকে মেসে খুব অল্প সময়ের জন্যই দেখিতেছিলাম। ক্লাশে তাহাকে এ কয়দিন একবারও দেখি নাই। ভাবিতেছিলাম, ইহার কারণ নিরুপমকে জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু যখনই তাহাকে দেখি তখনই তাহার মুখে এমন একটি বিষণ্ণতা লক্ষ্য করি যে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে আর সাহস হয় না। নিরুপমকে সত্যই আমি ভালবাসিয়াছিলাম। তাহার অসাধারণ কবি-প্রতিভা আমাকে তাহার প্রতি আরও দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল।

নিরুপমই সেদিন প্রথম বলিল, ক'দিন ক্লাশে যাই না ব'লে তুই হয়তো মনে মনে চটেছিস শৈবাল, নারে? কিন্তু মন যেখানে নেই সেখানে দেহটাকে

মিথ্যে টেনে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন কি বলতে পারিস ? আগে ক্লাশে না গেলেও মেসে থাকতাম, কিন্তু এখন মেসেও আর ভালো লাগে না।

কেন ভালো লাগে না ?—এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই অনেক কথা উঠিয়া পড়িল। সুযোগ পাইয়া তাহার আত্মীয় পরিজন কে কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করিলাম। যাহা আশা করিয়াছিলাম, উত্তরে তাহাই শুনিলাম। তাহার আত্মীয় পরিজন বলিতে কেহ কোথাও নাই। মাসের পর মাস, ঠিক একই তারিখে তবে তাহার টাকা আসে কোথা হইতে জিজ্ঞাসা করায় সে বিশেষ বিচলিত হইয়া বলিল, তার কথা নাই বা শুন্‌লি শৈবাল, তার কথা আমি কাউকে বলতে চাই না। তাহার কণ্ঠের কাতরতায় বিস্মিত হইয়া চুপ করিয়াই রহিলাম। কিন্তু সে রহস্য আবিষ্কারের লোভও আমার মধ্যে অতি তীব্র হইয়া উঠিল।

অনেক রাত্রেও সেদিন নিরুপম আর মেসে ফিরিয়া আসিল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার কথা ভাবিলাম, পরে উঠিয়া দরজাটা ভেজাইয়া রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। কত রাত্রে যে সেদিন সে মেসে ফিরিয়াছিল জানি না, কিন্তু ভোর বেলা তাহাকে তাহার শয্যায় গভীর নিদ্রায় মগ্ন দেখিয়া আর ডাকিয়া তুলিলাম না। আটটা নয়টার সময় তাহার ঘুম ভাঙিতে তাহাকে এক পেয়ালা চা করিয়া দিয়া বলিলাম, কাল অত রাত হ'ল কেন ফিরতে ? কোথায় গেছলি শুনি ?

নিরুপম প্রথমে নীরব হইয়াই রহিল, পরে বহুদিন-তৈল-স্পর্শ-বর্জ্জিত রুক্ষ চুলগুলি কপালের উপর হইতে হাত দিয়া সরাইয়া দিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপিয়া লইয়া বলিল, নির্দ্দিষ্ট কোথাও যাওয়ার জায়গা আমার নেই, তাই, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, বাসায় ফিরতে কেন জানি ভাল লাগছিল না।

—কিন্তু এম্‌নি রাত হ'লে লোকেই বা ভাবে কি ?

নিরুপম ম্লান একটু হাসিয়া বলিল, তুই তা' ব'লে যেন কিছু ভাবিস না

শৈবাল। মানুষের ব্রেন তো ভাববার জন্যই, সে তো ভাববেই—তা ভাবুক একটু।

বলিলাম, এমন পাগলও মানুষ আবার হয়! কিন্তু এটা যে মেস নিরুপম, নিজের বাড়ি হ'লেও কথা ছিল বরং।

নিরুপম হাসিয়া বলিল, তোর কোনও ভাবনা নেই শৈবাল, যে যা ভাবে, ভাবুক না—আমি নিজেই একদিন ভাল ক'রে এসবের জবাব দিয়ে যাব।

পরদিন রাত্রেও নিরুপম আর মেসে ফিরিতেছিল না। অনেকক্ষণ তাহার জন্য ঘড়ি ধরিয়া জাগিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপরে রাত একটা বাজিতে হতাশ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ নরুপমের ডাকে ঘুম ভাঙিল। জাগিয়া ঘড়িতে দেখি, রাত তিনটা বাজিয়াছে। নিরুপমের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে যেন কেমন ভয় পাইয়াছে। আমার একটা হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছে।

বলিলাম, তোকে যেন কেমন দেখাচ্ছে নিরুপম?

নিরুপম চকিত হইয়া বলিল, হুঁ, আমাকে কেমন দেখাবারই কথা। উঃ, আজ যা ভয় পেয়েচি, এখনও গা যেন কেমন করচে!

—ভয়? ভয় আবার কিসের? বলিয়া সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, সমস্ত বিকেলটা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যের পর ময়দানের দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সমস্ত মন আমার হাঁপিয়ে উঠেছিল নির্জ্জনতার জন্যে। একটা মস্ত গাছের তলায় বেঞ্চে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে কাটালাম, তারপরে খেয়াল হ'ল ময়দানের ওপর দিয়ে সোজা পাড়ি দিয়ে খিদিরপুরের ব্রীজের দিকের রাস্তায় গিয়ে পড়বার। পাগলামি আর কি! রাত্রে একা ময়দানে পাড়ি দিতে ভারি আনন্দ বোধ হচ্ছিল। জীবনে এত আনন্দ খুব কমই পেয়েছি। তারপরে আবার মাঠ

পার হ'য়ে চৌরঙ্গীর রাস্তায় পড়বার জন্যে যখন হাঁটতে শুরু করলাম তখন দেখি যে পা আমার যেন চলতে চায় না। কি রকম ভয় করতে লাগলো। তবু কোন রকমে পা টেনে ময়দানের মাঝে পৌঁছে দেখি আর এক পাও এগুতে পারি না। সর্ব্বনাশ! ভয়ে তখন আমার অন্তরাত্মা কাঠ হ'য়ে গেছে। অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এ আমার হ'ল কি! মরণকে তো কোন দিনই ভয় করতে শিখি নি, তবে এ আবার কোন্ নতুন অভিজ্ঞতা! কেবলই মনে হচ্ছিল, কারা যেন আমাকে সদলবলে মহা-সমারোহে খুন করতে আসছে। তারা সবাই সশস্ত্র, আর আমি নিরস্ত্র। মৃত্যুর এত বড় বীভৎস মূর্ত্তি কোনদিনই আমি কল্পনা করতে পারি নি। চিৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু কণ্ঠে স্বর আছে বলে মনে হ'ল না। হয় তো চিৎকারও করেছিলাম, কিন্তু রাতের বেহুঁস্ নিরালা ময়দানে কারও কানে হয়তো সে স্বর গিয়ে পৌঁছয় নি। ছি, ছি, লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছিলাম। আমার মত বেপরোয়া ছেলেরও জীবনে যে এমন অবস্থা আসতে পারে এ আমি কোনদিনই ভাবতে পারি নি। তারপরে যে কি হ'ল তার আর কিছুই আমার মনে পড়ে না। কেমন ক'রে এই ঘরে এসে যে হাজির হলাম তাও মনে নেই।

নিরুপম মুহূর্ত্তে সাবধান হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, না, আমাকে কোন অনুরোধ তোর ক'রে কাজ নেই। আমি তা কিছুতেই রাখতে পারবো না।

নিরুপম কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিল, কেন যে পারবো না তাই তোকে বলি শোন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা কি আজ জানিস্?···আমি চাই অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়েকে—এই এম্‌নি ক'রে আমার বাঁ হাতের ওপর কাৎ করে শুইয়ে তার বুকে ধারালো ইস্পাতের একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে হি হি ক'রে হেসে উঠতে।

সে ভঙ্গী করিয়া দেখাইয়া হি-হি করিয়া সত্যই এক অদ্ভুত পাশবিক

হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ভয় পাইয়াছিলাম। নিরুপম এসব কি প্রলাপ বকিতেছে? তাহাকে সাবধান করিয়া দিবার জন্যই বলিলাম, এসব পাগলের মত তুই কি বকচিস্ নিরুপম?

নিরুপম তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিল, পাগলামিই বটে শৈবাল! আমি একলা বসে কি ভাবি জানিস্? আমি কেন জন্মালুম এই স্বাস্থ্য, এই মন নিয়ে? আমার ভাগ্যকে মেনে নিয়ে চলতে পারলুম না কেন? পৃথিবীকে ঘৃণা করতে গিয়ে এই অপরূপ সুন্দরী মেয়েটির কথাই মনে হয়। একেই আমি সব চাইতে ভালবাসি—সব চাইতে ঘৃণা করি। এই সুন্দরের মধ্যে বীভৎসতা—

বলিলাম, এ তোর বিকৃত মনের চিন্তা।

নিরুপম হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, বিকৃত অবিকৃত বুঝি না। ভাল কথা, ময়দানের মাঝে একা এত রাত্রে কখনও যাস্ নি আমার মত, না? গেলে পরে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা লাভ হ'ত। ময়দানের মাঝে এম্‌নি গভীর নির্জ্জন রাত্রে পৃথিবীর সব চেয়ে সুন্দরী যে নারী তাকে বাঁ হাতের ওপর সপ্রেম সমাদরে শুইয়ে তার বুকে ধারালো একখানা ছুরি বসিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতেও যে তৃপ্তি, সে তৃপ্তি দুনিয়ার আর কিছুতেই থাকতে পারে না—এই আমার বিশ্বাস।

নিরুপমকে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিলাম, তোকে আজ কিসে যেন পেয়ে বসেচে, যা, শুয়ে থাকগে যা। কাল তোর সব কথা ভাল করে শুনবো। আজ অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

নিরুপম যে এত সহজে থামিবে তাহা ভাবিতে পারি নাই। সে অতি শান্ত শিশুর মত আপনার শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে-রাত্রে আর ঘুমাইতে পারি নাই। কেবলই থাকিয়া থাকিয়া চম্‌কাইয়া উঠিয়াছি—নিরুপমের নারীহত্যার কাল্পনিক অভিনয়ের ভঙ্গী স্মরণ করিয়া।

নিরুপমের নিষ্ঠুর কামনা যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া আমার চোখের সামনে জাগিয়া রহিল। তাই কিছুতেই আর ঘুমাইতে পারিতেছিলাম না।

নিরুপমের কথাগুলি যদিও প্রলাপের মত শুনায় তথাপি কেন জানি অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাই নিরুপমের জন্য ভাবনাগ্রস্ত হই। আবার মাঝে মাঝে মনে হয়, সে কবি—সত্যকারের কবি, তাহার অনুভূতির তীব্রতায় সে এসব কথা বলিয়া চলিতেছে হয় তো, আবার একটা নূতন ভাবধারা তাহার মধ্যে খেলিতে শুরু করিলেই এসব মিথ্যা অর্থহীন হইয়া যাইবে। সে নিশ্চয় কোথাও যেন ঘা খাইয়াছে, নহিলে তাহার জীবনে এসবের কোন অর্থ হয় বলিয়া তো মনে হয় না। এ যদি শুধু কবির খেয়াল হয়, তবে অদ্ভুতই বলিতে হইবে। কিন্তু শুধু কবির খেয়াল বলিয়া কেন জানি ভাবিতে পারি না। মাঝে মাঝে নিরুপমকে দেখিয়া মনে হয়, মুখ-চোখ যেন তাহার গভীর ব্যথায় থম্ থম্ করিতেছে। তবু সাহস করিয়া তাহার ব্যক্তিগত জীবনের কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে পারি না।

দিন তিন চার পরের কথা। নিরুপম ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া তাহার শয্যায় কবিতা লিখিতেছিল। রাত তখন প্রায় বারটা। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার মুখ-চোখের স্ফীতি, কুঞ্চন ও বিক্ষোভ লক্ষ্য করিতে করিতে কখন আপনার অজ্ঞাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিল দরজায় আঘাত শুনিয়া। দরজা খুলিবার জন্য শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। নিরুপম তখন বেঘোরে ঘুমাইতেছে। ভাবিলাম, কাল হয়তো অধিক রাত জাগিয়া কবিতা লিখিয়াছে তাই ঘুম ভাঙ্গিতে তাহার আজ একটু বেলা হইবে। একটা খদ্দরের চাদরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত।

ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়াই অবাক হইয়া গেলাম।

আগন্তুক—অপরিচিতা স্ত্রীলোক—অপরূপ সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী। একত্রে এতখানি রূপ জীবনে আর কখনও কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া তো মনে পড়িল না।

আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম—হঠাৎ মনে হইল, পটের মূর্ত্তির যেন ধ্যান ভাঙ্গিল। দু'খানি ওষ্ঠ অতি ধীরে বিচ্ছিন্ন হইল। আগন্তুক বলিল, নিরুপম বুঝি এই ঘরেই থাকে? তোমারই নাম শৈবাল?

আমার ও ধ্যান ভাঙ্গিল। কোন রকমে তাহার কথার উত্তরে বলিলাম, হুঁ।

ঝড়ের বেগে সে আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তার পরেই নিরুপমের শয্যার উপর গিয়া আছড়াইয়া পড়িয়া ডুক্‌রিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অল্প পরেই চকিতে সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া বসিয়া চোখের জল কাপড়ে মুছিতে মুছিতে ডাকিল, লাল সিং।

লাল সিং দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। আগতার আহ্বানে সে সম্মুখে আসিয়া দাড়াইল। আগতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, লাল সিং, দাদাবাবু বিষ খেয়েছে বোধ হয়, জলদি তা'কে গাড়ীতে তুলে দিতে হবে—মেডিকেল কলেজ নিয়ে যাব।

আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সে আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, শৈবাল, তুমি এর বিন্দু বিসর্গও জান না বোধ হয়? তুমিও গাড়ীতে উঠে আমার সঙ্গে মেডিকেল কলেজে চল—সব শুনতে পাবে।

তিনজনে ধরাধরি করিয়া নিরুপমকে বাহিরে যে মোটর দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে তুলিলাম। আমি কতকটা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিয়া গেলাম।

গাড়ীতে উঠিয়া বসিতেই মেয়েটি আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়া বলিল,

কাল রাত নটা দশটার সময় নিরুপম আমার ওখানে গিয়ে লাল সিংকে এই চিঠি দিয়ে আসে। আমি তখন বাড়ি ছিলাম না। শনিবার রাত্রে আমাকে হাস্নুবাদের জমিদারের দমদমের বাগান বাড়িতে গিয়ে থাকতে হয়, ফিরতে সকাল হয়ে যায়। আমি হাস্নুবাদের জমিদারের রক্ষিতা।

আর সেই ছিল নিরুপমের রাগ, নিরুপম আমার ছোট ভাই। ভোর বেলা বাড়ি ফিরেই দেখি এই চিঠি।

মেয়েটির কোলে নিরুপমের মাথা ছিল, সে ঝুকিয়া পড়িয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিরুপম লিখিয়াছিল—

ছোড়দি! আমার দেহে যে বিষের জ্বালা তুমি ছড়িয়ে দিয়েছ তা' আর কিছুতেই থামতে চায় না, তাই সংকল্প করেছি যে, বিষ দিয়ে বিষক্ষয় করবো। কাল ভোরে বাগান-বাড়ি থেকে ফিরে আমার মেসে গেলেই সব জানতে পারবে। হয়তো তখন আমি সমস্ত পার্থিব জ্বালার অতীত। সে যে কি তৃপ্তি—আর কাউকে আমি বোঝাতে পারবো না। আমার আত্মহত্যার পরে পুলিশের হাঙ্গামা হওয়া খুবই স্বাভাবিক; দেখো আমার রুম-মেট্ শৈবাল যেন কোনও বিপদে না পড়ে। আমার মৃত্যুতে সে যে সব চেয়ে বেশি শোক পাবে তা আমি জানি, আমাকে সত্যই সে ভালবেসেছিল। তার ঋণ শোধ ক'রে যাবার মত কিছুই আমার নেই, আমার কবিতা তার ভাল লেগেছিল, সেগুলো তাকেই আমি দান ক'রে গেলাম, সে তা দিয়ে যা খুসি করতে পারবে। বন্ধুকে সে যেন ক্ষমা করে।

ইতি নিরুপম।

পুঃ—কবির চোখে দুনিয়া সুন্দর ব'লে যাদের ধারণা তাদের ভুল যেন ভাঙে।—নি।

হঠাৎ অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে নিরুপমের মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিতেই মনে পড়িল, নিরুপম একদিন বলিয়াছিল, 'আমি নিজেই একদিন ভাল ক'রে এসবের জবাব দিয়ে যাব।'

সুন্দর জবাব! কিন্তু নিরুপম যে এত নিষ্ঠুর হইতে পারে ইহা কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। নিরুপম ক্ষমা চাহিয়া আমাকে বিপন্ন করিয়া গেছে। তাহাকে ক্ষমা আমি কোনদিনই করিতে পারিব না।

এই সেই ব্যথা-তীর্থ

ভোরে ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই তিমিরবরণ তাহার ঘরের সম্মুখের বারান্দায় চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে আসিয়া দাঁড়ায়। এই বারান্দাটি ছোট—অতি ছোট একেবারে, এবং ঠিক তাহার একার পক্ষে কষ্টে বাসযোগ্য ঘরেরই মাপসই—একচুলও বড় হইবে না। বারান্দাটি বড় রাস্তারই ঠিক উপরে অবস্থিত—এখানে দাঁড়াইলে রাস্তার বহুদূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে। ত্রিতলের বারান্দা এটি—কাজেই বহু উচ্চে অবস্থিত হওয়ার ফলে রাস্তার একটা নূতন রূপ এখানে দাঁড়াইলে চোখে ধরা পড়ে। তিমিরবরণ সে রূপ আজ তিন বৎসর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছে, কখনও জনবিরল নিষ্প্রাণ, কখনও জনাধিক্যে অস্থির চঞ্চল, কখনও আবার একেবারে উন্মাদ··· কখনও হয়তো এমন আবার যে, তিমিরবরণ তাহা প্রকাশের যোগ্য ভাষা খুঁজিয়া পায় না।

এখানে দাঁড়াইয়া নিত্য ভোরে তিমিরবরণ অনারব্ধ-কর্ম্ম শহরের মূর্ত্তিটা একবার দেখিয়া লয়, তার পর দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিয়া দিয়া দেখে এই পৃথিবীর একটা মূর্ত্তি। আর ভাবে, এই সেই ব্যথা-তীর্থ! পৃথিবীর পানে চাহিয়া নির্জ্জন মুহূর্ত্তে তাহার এই একমাত্র কথাই মনে জাগে। আর এই পৃথিবীর মানুষের কথাটাও সেই সঙ্গে একবার সে না ভাবিয়া পারে না,—এই সেই ব্যথা-তীর্থের যাত্রীদল!

তার পরে একে একে মনে জাগে বহু কথা।—সেই রাজার দুলাল বুদ্ধের কথা! এমন আরও কত কথা! গোটা ভারতবর্ষের একটা ব্যথা-কাতর রূপ জাগিয়া উঠে তাহার চোখের সম্মুখে।

তার পর নিজের কথা। এই তীর্থের সেও তো একজন যাত্রী। সামান্য যাত্রী সে—তাহারই সম্মুখে বিস্তৃত পড়িয়া রহিয়াছে আদি অনন্ত কাল ধরিয়া সেই মহাতীর্থ—যুগে যুগে যেন সে ঐ একই নামে পরিচয় দিয়া আসিতেছে—ব্যথা-তীর্থ!

ভোরের পৃথিবীর রূপ নিবিষ্ট হইয়া দেখিবার মত সময় তিমিরবরণের নাই। সকালে তাহাকে দুইটি বাড়িতে ছাত্র পড়াইতে যাইতে হয়; তার পর নিজের কলেজ আছে, সে বি-এস-সি পড়ে। তাড়াতাড়ি ছাত্র-পড়ানোর কাজটা তাহাকে সমাধা করিতে হয়। সে কোনও রকমে চোখ মুখ ধোওয়ার কাজ শেষ করিয়া রাস্তার দিকের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া এবং ভিতরের দিকের দরজায় তালা লাগাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। তিমিরবরণের বাসাটি একটি হোটেল—নিচের তলায় হোটেল ও রেষ্টুরেণ্ট্ এবং উপরের দুই তলায় স্থায়ীভাবে ভদ্রলোকদের থাকিবার ব্যবস্থাও আছে। দশ-বারো জন নানা বয়সের অধিবাসী প্রায় স্থায়ী ভাবেই আজ বহুদিন ধরিয়া এখানে বসবাস করিতেছে। তিমিরবরণও তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া দিল এই হোটেলের ত্রিতলের ঐ ছোট ঘরটিতে থাকিয়া। এখন এই ঘরটিই তবু তাহার কাছে আপনার হইয়া গিয়াছে। কারণ, এত বড় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় স্থান তাহার জানা নাই যেখানে জ্ঞানতঃ সে ইহার অধিক কাল একযোগে বসবাস করিয়াছে। তাহার নিকট-আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র মধ্যম মাতুল সপরিবারে বর্ত্তমান। তিনি ধনী, কাজেই তিমিরবরণ আত্মশ্লাঘার পক্ষে হানিকর মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে আত্মীয়তা বজায় রাখে নাই। অবশ্য সে-পক্ষও ইহার প্রতিবাদকল্পে এমন কিছু কোন দিন করে নাই যাহার জন্য তিমিরবরণের প্রতি কোন দোষারোপ করা যাইতে পারে। দুঃখ-দৈন্য-দারিদ্র ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াই বহুবার জীবনে তাহাকে দেখা দিয়াছে, কিন্তু কোন অবস্থাতেই সে ধনী মাতুলের কাছে প্রার্থীরূপে গিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই, এবং জীবনে হয়তো আর

পারিবেও না—যদিও সে জানে যে আমরণ এই ব্যথা-তীর্থে তাহাকে দুঃখ দৈন্য চরণে জড়াইয়া পথ চলিতে হইবে।

তিমিরবরণ নিচের রেষ্টুরেণ্ট্ হইতে এক কাপ চা একটু একটু করিয়া কণ্ঠে ঢালিয়া নিঃশেষ করিয়া ছাত্র পড়াইতে বাহির হইয়া গেল। ছাত্রের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া পা আর তাহার উঠিতেছিল না। দুই দিন সে পড়াইতে আসিতে পারে নাই। অবশ্য, না আসিতে পারার যথেষ্ট কারণই তাহার রহিয়াছে, কিন্তু সে-কথা যদি ছাত্রের পিতা বিশ্বাস না করেন? সুরেশ্বরবাবুর প্রতি তিমিরবরণের কেন জানি ধারণা অত্যন্ত বিরূপ ছিল। লোকটির কথাবার্ত্তা কেমন যেন রূঢ়। সত্যই সুরেশ্বরবাবু যদি এমন কিছু কঠিন কথাই তাহাকে বলিয়া বসেন তো কি তাহার যথাকর্ত্তব্য হইবে তখন? তিমিরবরণ একবার মাত্র সে-কথা ভাবিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সোজা হইয়া দাঁড়াইল। দুঃখ দারিদ্র্য জীবনে তাহার এমন কিছু অপরিচিত নয়, তবে আর তাহার ভাবিবার কি আছে। পনর টাকার মায়া সে সহজেই কাটাইয়া উঠিতে পারিবে।

তিমিরবরণ গেটের ভিতর পা বাড়াইয়াই একেবারে সুরেশ্বরবাবুর সম্মুখে পড়িয়া গেল। সুরেশ্বরবাবু তাঁহার বাগানে পায়চারি করিতেছিলেন এবং একটা চাকরের প্রতি কি যেন উপদেশবাণী বর্ষণ করিতেছিলেন। তিমিরবরণকে দেখিয়া সুরেশ্বরবাবু উপদেশ-বর্ষণ বন্ধ করিয়া তাহাকে বলিলেন, আজ একটু বেশি ভোরে এসে পড়া হয়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে না কি?

তিমিরবরণ লজ্জিত হইয়া উঠিল।

সুরেশ্বরবাবু একটু যেন সময় লইয়াই আবার বলিলেন, দেখ তিমির, তোমার খুশিমত তুমি কামাই করগে তাতে আমার আসবে যাবে না

কিছুই, কিন্তু বিণ্টুর পাশ করা চাই বছর বছর। ব্যস্, তা'হ'লেই হ'ল।

তিমিরবরণ অপ্রতিভ ভাবটা কোন রকমে কাটাইয়া উঠিতে না পারিয়া নিজের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন বলিয়া ফেলিল, আমি ইচ্ছে ক'রে আর কামাই করি নি এ দু-দিন, বিশেষ কাজ ছিল তাই বাধ্য হয়েছি কামাই করতে।

সুরেশ্বরবাবু কেমন যেন একটু হাসিয়া বলিলেন, আমি কি তা অস্বীকার করছি বাপু। হুঁ, কাজ তো মানুষের থাকতেই পারে। মাসে অমন জরুরি কাজ বেশি থাকলেই একটু অসুবিধার কথা যে!

বলিয়া সুরেশ্বরবাবু আবার চাকরের প্রতি ফিরিয়া তাহারই সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তিমিরবরণ অস্বস্তিকর একটা উত্তেজনা লইয়া ক্ষণেক সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল এবং অশোভন কিছু করিয়া ওঠা তাহার দ্বারা সম্ভব নয় জানিয়াই যেন পড়াইবার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

দুইদিন সে পড়াইতে আসিতে পারে নাই এবং সেজন্য নিজের কাছেই সে যথেষ্ট লজ্জিত হইয়াছিল, এ অবস্থায় তাহাকে তাহার দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় তিমিরবরণের মনের অবস্থা যে কত দূর খারাপ হইয়াছিল তাহা অবশ্য তাহার ছাত্র বিণ্টু ধরিতে পারিল না, কিন্তু মাষ্টার-মশাই যে আজ সুস্থ মনে নাই তাহা সে বুঝিল। একবার তাই সে জিজ্ঞাসা করিয়াও বসিল, আপনার কি জ্বর হয়েছিল মাষ্টার-মশাই?

তিমিরবরণ এ প্রশ্নের উত্তরে সহজভাবেই বলিল, না বিণ্টু, আমার এক বন্ধুর বোনের বিয়ে হ'ল—তাই এ দু-দিন আসতে পারি নি। তারা আমাকে কিছুতেই এ দু-দিন পড়াতে আসতে দিলে না। তোমার কি পড়ার খুব ক্ষতি হয়েছে তাতে?

বিণ্টু বলিল, না। কেন, বাবা কিছু বলেছেন নাকি?

তিমিরবরণ বলিল, না। এম্‌নিই জিজ্ঞেস করছি। ক্লাসে এ দু-দিনে যদি বেশি কিছু পড়ানো হ'য়ে গিয়ে থাকে তো রবিবার দিন এসে তা পড়িয়ে দিয়ে যাব'খন।

বিণ্টু তাড়াতাড়ি বলিল, না মাষ্টার-মশাই, রবিবার আসবেন না। রবিবার আমি পড়ব না কিছুতেই। ছুটির দিনে আবার পড়া কিসের!

তিমিরবরণ অন্য দিনের তুলনায় আজ একটু বেশি সময় বিণ্টুকে পড়াইয়াই বিদায় লইল। আবার অন্যত্র তাহাকে ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইবে। সেখানেও আবার এই একই পর্ব্বের আশঙ্কা রহিয়াছে।

দ্বিতীয় বাড়িতে তিমিরবরণ নিতান্ত ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিল। কি জানি, অনন্তবাবুও যদি আবার সহসা সুরেশ্বরবাবুর মতই কোন নিদারুণ কিছু বলিয়া আঘাত করিয়া বসেন তো সে কেমন করিয়া যে এই ট্যুইশান্ বজায় রাখিবে তাহা সে কিছুতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সুরেশ্বরবাবুর এক কথার পরেই সে যে কেন ঐ সামান্য পনর টাকা অবজ্ঞাভরে ছাড়িয়া দিয়া আসিতে পারিল না তাহাও সে ভাবিয়া পাইতেছিল না। অনন্তবাবু সামান্য কোন কথা বলিলেই হয়তো সুরেশ্বর-বাবুর প্রতি যে আচরণের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে তাহার দিক হইতে তাহা সে চরম করিয়া ক্ষোভ মিটাইয়া সম্পন্ন করিবে।

কিন্তু অনন্তবাবু তিমিরবরণকে দেখিয়া একটা কথাও বলিলেন না। তিমির-বরণ যে এই দুই দিন পড়াইতে আসে নাই তাহা যেন তিনি জানেন না এমন একটা আভাস তাঁহার নীরবতা হইতে অনুমান করিয়া লইলে কিছু-মাত্র অন্যায় করা হয় না। তিমিরবরণ ইহাতে অধিকতর অস্বস্তি অনুভব করিল। কত কথাই তাহার মনে জাগিতেছিল। এমনও তো হইতে পারে যে অনন্তবাবু তাহার এই দুই দিন কামাই হওয়ায় এত দূর চটিয়াছেন যে

একটি কথাও তিনি বলিতে পারিলেন না। এসব ক্ষেত্রে নীরবতা মানুষকে মুক্তি দেয় না কোনদিনই, বরং অন্যায়টাকে আরও স্পষ্ট, আরও বৃহৎ করিয়া তোলে। তিমিরবরণের কাছেও ব্যাপারটা তেমনই দাঁড়াইয়া গেল। ইহা অপেক্ষা সুরেশ্বরবাবুর বক্তব্য সহজে সহ্য করা চলে। এ যেন কিছুতেই সে সহিতে পারিতেছিল না !

অনন্তবাবুর তৃতীয় পুত্র সুমন্ত তাহার ছাত্র। সুমন্ত আসিয়া যথাস্থানে বই খুলিয়া বসিল। তাহার বই খুলিয়া বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মা মায়া দেবী আসিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইলেন।

তিমিরবরণের মনের অবস্থা তখন ভীষণ। না-জানি মায়া দেবী কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া বিপদ ঘনাইয়া তোলেন।

মায়া দেবী বলিলেন, বাবা তিমির, তোমার কি কোন অসুখ-বিসুখ করেছিল ? দিনকাল যা পড়েছে—তাই বড় ভাবনা হয়। আজ না এলে কালই হয়তো সুমন্তকে তোমার মেসে পাঠাতে হ'ত। বড়ই ভাবনার কথা—যা দিন-কাল পড়েছে ! একটু সাবধানে চলাফেরা ক'রো বাবা—আর শরীর যদি তোমার ভাল না থাকে তো পড়াতে এসে কাজ নেই—সবার আগে শরীরের যত্ন ! তা আজকালকার ছেলে তোমরা, তোমরা কি কারও কথা শুনবে। এখন ভাবনা তাই যত আমাদের।

মায়া দেবী থামিলে তিমিরবরণ নিতান্ত অপরাধীর মত যেন বলিল, না মাসীমা, অসুখ-বিসুখ তো আমার হয় নি কিছু। আমার এক বিশেষ বন্ধুর বোনের পরশু বিয়ে গেছে, তাই এ দু-দিন তারা আমাকে আসতে দেয় নি কিছুতেই।

মায়া দেবী তখন বলিলেন, তবে আজ বাবা না এলেই তো ভাল করতে। এ দু-দিন সেখানে খাটা-খাটনি গেছে তো—মানুষের শরীরে কত আর দেয় বাবা ! আজকের দিনটাও বিশ্রাম নিলেই তো ভাল করতে।

তিমিরবরণ নীরব হইয়াই রহিল। মায়া দেবী বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন। তিমিরবরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মানুষের সহানুভূতি, দরদ, দয়াদাক্ষিণ্য, মায়া···এ-সব আর তাহার ভাল লাগে না। মানুষের দুঃখবোধকে ইহারা যেন আরও প্রখর করিয়া তোলে, বেদনাকে আরও বড় করিয়া চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে যেন। মায়া দেবীর স্নেহাপ্লুত সহানুভূতির করুণ স্পর্শে সুরেশ্বরবাবুর ব্যবহারের রূঢ় অপমান আরও উগ্র দুঃসহ হইয়া উঠে।

ছাত্র পড়ানো সকালের মত শেষ করিয়া তিমিরবরণ হোটেলে ফিরিয়া আসার পথে মিনার কথাই ভাবিতে থাকে। এ দুই দিন সে মিনার কথা ভাবিবার অবসরই যেন পায় নাই বলিয়া তাহার মনে হয়। কিন্তু আসলে মিনার কথা গভীরভাবে তাহার জীবনকে এ দুইদিন দোলা দিয়াছে। তবে সে-ভাবনার আর শেষ নাই জানিয়াই ভাবিতে সে চেষ্টা পায় নাই। মিনা তাহার বন্ধু সুব্রতর বোন। এই মিনারই বিবাহ উপলক্ষে এ দুই দিন তাহার সমস্ত কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। এই মিনাকে তিমিরবরণ গভীর ভাবে ভালবাসিয়াছিল এবং এ-কথা সে উপলব্ধি করিয়াছিল সেই দিন যেদিন মিনার বিবাহের কথা পাকাপাকি রকমে ঠিক হইয়া গিয়াছিল। আবশ্য, তাহার পূর্ব্বে উপলব্ধি করিলেও মিনাকে জীবনে পাওয়ার কোন যোগ্যতাই তাহার ছিল না। মিনাও যে তাহাকে ভালবাসিয়াছিল তাহাও সে মিনার বহুদিনের আচরণের ভিতর দিয়া যেন বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের হৃদয়ের ভাব অপরের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িলেও কেহ তাহার মূল্য দেয় নাই। না দিবার কারণও যথেষ্ট বর্ত্তমান ছিল। মিনা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা,

সুপ্রতিষ্ঠিত গৃহের বধূ হইবার মত যোগ্যতা তাহার আছে, কাজেই তিমিরবরণের যে কোন দাবি মিনার উপর থাকিতে পারে তাহা কেহ ভাবিয়া দেখা কোনদিন প্রয়োজন মনে করে নাই। তিমিরবরণ নিজেকে ভাল করিয়াই চিনিত---সে যে গৃহহীন, জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত—তাহা সে ভাল করিয়াই জানে। কাজেই অন্তরের ভীরু দাবি যে প্রকাশের যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, নীরব হইয়াই ছিল। তিমিরবরণের যা-কিছু সামান্য প্রতিষ্ঠা সে শুধু লেখক-হিসাবে। মিনা ছিল তাহার গল্পের প্রধান পাঠিকা এবং অপ্রশংসা ও বিদ্রূপের ভিতর দিয়া চিরদিন সে তিমিরবরণের লেখায় উৎসাহ জোগাইয়া আসিয়াছে। তিমিরবরণ কিন্তু তাহার মনের কথাটা ধরিতে পারিয়াছিল। আজ তাই তিমিরবরণের কেন জানি মনে হয়, মিনার প্রতি সে অবিচার করিয়াছে এবং দুনিয়া অবিচার করিয়াছে তাহার প্রতি। জীবনে মিনার সাক্ষাৎ না ঘটিলে হয়তো লেখক-হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য কোন আগ্রহই তাহার মধ্যে দেখা দিত না। কারণ, অজ্ঞাত অপরিচিত পাঠক-পাঠিকার জন্য তাহার হৃদয়ে কোন অনুভূতি ছিল না বলিলেই হয়। মিনার প্রেরণায় সে অজ্ঞাত পাঠক-পাঠিকার কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে, কিন্তু মিনার প্রেরণার অবর্ত্তমানেও তাহাদের চোখে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইবে।

তিমিরবরণ হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহারই পাশের ঘরে সুব্রত অনাদি বক্সীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছে। সুব্রত যে তাহারই কাছে আসিয়া ওখানে অপেক্ষা করিতেছে তাহা তিমিরবরণ সহজেই বুঝিল।

নিজের ঘরের দরজা খুলিয়া সুব্রতকে সেখানে আনিয়া বসাইয়া বলিল, কি রে, কলেজ যাবি না আজ ?

সুব্রত বলিল, না, শরীরটা আজ ভাল না। ক'দিন খাটুনি গেছে,

বাড়িটাও আজ একটু হাল্কা হয়েছে, আজকের দুপুরটা তাই শুয়ে কাটাবার মতলব করেছি।

তিমিরবরণ বলিল, সে মন্দ কথা না। আমার পার্সেণ্টেজ শর্ট প'ড়ে যাবার ভয় না থাকলে আমিও শুয়ে কাটাতাম আজকের দুপুর।

সুব্রত বলিল, নে, রাখ্ বাপু! পার্সেণ্টেজের ভাবনায় তাব'লে সুস্থিরে থাকতে পারব না! খুব হয়েছে! এখন চল্ আমার সঙ্গে, খাওয়া-দাওয়া চানটান্ আমাদের ওখানেই হবে'খন। রাখ্ তোর কলেজ আজ—ও তো আছেই!

সুব্রত যে তাহাকে সহজে ছাড়িয়া দিবে না তাহা তিমিরবরণ বুঝিল, কাজেই নির্ব্বিবাদে সে সুব্রতর প্রস্তাবেই রাজি হইল।

সুব্রত ভীষণ খেয়ালী—কখন যে তাহার মাথায় কি খেয়াল চাপিয়া বসে তাহার ঠিক নাই। পথে নামিয়াই সে বলিল, একটু ঘুরে যেতে হবে। বোস-সাহেবের বাড়ির কাছে আমার একটু দরকার আছে।

তিমিরবরণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, বুঝেছি। সে এমন কিছু দরকার নয় যে না গেলেই নয়। আর তা'ছাড়া বোস-সাহেবের মেয়ে এতক্ষণে কলেজে চলে গেছে বোধ হয়।

সুব্রত তিমিরকে একটু ঠেলিয়া দিয়া বলিল, যা, ও-ছাড়া আর যেন কোন দরকার মানুষের থাকতে নেই! আর সে কলেজে যাক ছাই না-যাক তা'তে আমার কি!

তিমিরবরণ বলিল, না, তোর যে কিছু তা কি আমি বলছি। আচ্ছা চল, ঘুরেই যাওয়া যাক তো। বোস-সাহেবের মেয়েটির ব্যবহার কিন্তু চমৎকার! মিনার বিয়ের দিনে একলাই তো ও মেয়েদের তাল সামলেছে বলতে গেলে। সুব্রত কেমন যেন একটু বিব্রত হইয়া বলিল, নে, প্রশংসায় আর শতমুখ হ'তে হবে না। অমন লোক-দেখানো কাজ সবাই করতে পারে।

—না, সবাই পারে না। আর, সবাই পারলে—অনুরূপের বোনও তো সেদিন এসেছিল—সেও তার নমুনা দেখিয়ে যেতে পারত। সে তো কই একটা মুখের কথা ব'লে পর্য্যন্ত কাউকে খুশি করতে পারলে না।—বলিয়া তিমিরবরণ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল।

সুব্রত অমনি ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাজ নেই ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে। চল্, সোজা বাড়িই যাই।

তিমিরবরণ জোরে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নে, ন্যাকামো ঢের হয়েছে। তোর ইচ্ছেটা বুঝতে যেন লোকের আজও বাকী আছে। একটু তাড়াতাড়িই চল্, পথে বোস-সাহেবের গাড়ির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটলেও ঘটতে পারে বা।

সুব্রত অভিমানভরে বলিল,···না, কিছুতেই যাব না। সেদিন প্রীতি আমাকে ভয়ানক অপমান করেছে। ও যদি আর কারও মেয়ে হ'ত তা হ'লে —

তিমিরবরণ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—সেকি! প্রীতি কাউকে অপমান করতে পারে ব'লে তো আমার ধারণা নেই। আরও বিশেষ ক'রে তোকে ও অপমান করবে কি!

সুব্রত গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, তা ও পারে। কিন্তু বোস-সাহেবের মেয়ের মত কাজ সেটা ওর হয় নি। রাস্তায় হেঁটে আমার সঙ্গে বেড়াচ্ছিলো, হঠাৎ নজরে পড়ল বাবুল রায়ের বেবী-অষ্টিন্, অম্নি হাত তুলে গাড়ি থামালে। ভাবলাম, কি যেন কথা আছে, তা শেষ ক'রেই হয়ত দেবে বাবুল রায়কে বিদায়। কিন্তু তা নয়—চট ক'রে গিয়ে উঠে বসল ওর গাড়ীতে। উঠেই আমাকেও তুলতে চাইল সে গাড়ীতে, কিন্তু আমি রাজি না হওয়ায় দিব্যি সে বাবুল রায়ের সঙ্গেই গেল চ'লে। এর চেয়ে আবার মানুষকে অপমান করা যায় কেমন ক'রে শুনি?

শেষের কথাটায় সুব্রতর অভিমান যে কত গভীর তাহা তিমিরবরণ বুঝিল।

কাজেই চট্ করিয়া কিছু বলিতেও সে সাহস পাইতেছিল না। পাছে সুব্রতকে তাহা আঘাত করে।

সুব্রত তিমিরবরণকে নীরব দেখিয়া বলিল, না, ওদিক ঘুরে যাবার আমার কোনও প্রয়োজন নেই। সোজা বাড়িতেই চ'—খেয়ে-দেয়ে বহুদিন পরে আজ আবার কবিতা পড়া যাবে'খন।

তিমিরবরণ আর কোনও কথা না বলিয়া সুব্রতর সঙ্গেই চলিতে লাগিল। গলির মুখেই একেবারে বিজলীর সঙ্গে তাহাদের দেখা। ভালই হইল। বিজলী কলেজে চলিয়াছে, 'প্রক্সী'র কথাটা তাহাকে বলিয়া দিলেই হইবে। আর এ সব ব্যাপারে বিজলী সুচতুরও বটে। কিন্তু তাহারা কিছু বলার পূর্ব্বেই বিজলী বলিল, রোল টোয়েন্টির খবর শুনেছিস ?

—কে, বিশ্বজিতের কথা বলছিস তো ? সেই ভাল ছেলের কথা তো ? আরে, সেই যে আমাদের বহরমপুর কলেজের স্কলার ? কই না, কেন হয়েছে কি ?

বিজলী মহা বিস্ময়ের সঙ্গে বলিল, কিছুই শুনিস নি ? সারা ক'ল্‌কাতা শহরটা জেনে গেল, আর তোরা তার কিছুই জানিস না ? বিশ্বজিৎ যে স্যুইসাইড্ করেছে !

—এঁ্যা, স্যুইসাইড্ ? সত্যি ?

বিজলী বিষণ্ণ কণ্ঠে বলিল, হুঁ। হতভাগা শেষকালে কিনা পোটাসিয়াম্ সায়ানাইড খেয়ে—

তিমিরবরণ এক রকম আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিল—আমাদের বিশ্বজিৎ ! বলিস কি বিজলী ?

বিজলী বলিল, আর বলাবলি কি, কার ভেতরে যে কি আছে তা কি কেউ বলতে পারে ? সকালবেলা কলেজ হোষ্টেলে গিয়ে দেখি এই ব্যাপার। একটা দুর্ব্বোধ্য চিঠিও নাকি তার বালিশের নিচে পাওয়া গেছে। সে চিঠিতে আছে, গুচ্ছের হেঁয়ালি—হয়ত বা প্রেমেই পড়েছিল। বিচিত্র কি !

সুব্রত বলিল, দূর! বিশ্বজিতের মত ভাল ছেলের পক্ষে তা কি সম্ভব কখনও!

তিমিরবরণ বলিল, বেশি ভালদের নিয়েই তো এই সব বিপদ যত।

বিজলী বলিল, রাখ তোর ভাল ছেলে! যত সব মুখখুর দল! আহা, কি সুদৃষ্টান্তই রেখে গেলেন পৃথিবীতে! একেই তো বাপু বিষ-ছড়ানো পৃথিবীতে কোন রকমে কায়ক্লেশে বেঁচে আছি, তার মধ্যে আবার এসব কেন?

বিজলী যেমন দুঃখিত হইয়াছিল তেমন আবার ক্ষুণ্ণও হইয়াছিল। বিশ্বজিতের এই আত্মহত্যায়। বিশ্বজিতের দুঃখ যত বড়ই হউক না কেন, বিজলী তাহাকে কোনদিনই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

তিমিরবরণ কিন্তু সহজেই বিশ্বজিতকে ক্ষমা করিতে পারিল তাহার আত্মহত্যার কোন কারণ যথাযথভাবে না জানিয়াও। এমনও তো হইতে পারে যে প্রেম তাহার আত্মহত্যার কারণ একেবারেই নয়। আর তাহা যদি হয়ও তবুও তিমিরবরণ তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিবে। বিশ্বজিৎ ও তো এই ব্যথা-তীর্থেরই এক জন যাত্রী ছিল—তীর্থের ওপারে সে অনায়াসেই পৌছাইয়া গিয়াছে, বাঁচিয়াছে। বিশ্বজিতের প্রতি তাহার কোনও অভিযোগ নাই।

সুব্রতর অভিযোগ ছিল। কেননা, সুব্রতকে সে সত্যই ভাবাইয়া তুলিয়াছে। প্রেমে পড়িয়া মানুষের আত্মহত্যার অবস্থাও কখনও আবার আসিতে পারে নাকি? বিচিত্র জগৎ—এখানে সকলই সম্ভব! সুব্রত কেমন হতাশ ও ব্যাকুল হইয়া উঠে।

তারপরে বিজলী দুই একটা কথার পরেই বিদায় লইয়া চলিয়া যায়। 'প্রক্সী'র কথা বলিয়া দিতে তাহাদের আর মনে থাকে না। অবশ্য কলেজ ছুটি হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, কাজেই তাহারা সেজন্য ভাবনাগ্রস্তও হয় না।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়াই তাহারা শুনিতে পায় যে, সুব্রতর পাঁচ বৎসর বয়স্কা ছোট বোন লীনা কাঁদিয়া-কাটিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া তুলিয়াছে এবং বায়না ধরিয়াছে তাহাকে তাহার দিদির কাছে অবিলম্বে পৌঁছাইয়া দেওয়া হউক। এ দুই দিন কিন্তু সে চুপ-চাপ ছিল। আজ কিন্তু তাহাকে সামলানো দায় হইয়া উঠিয়াছে।

সুব্রত এ সংবাদে চটিয়া গিয়া বলিল, তা মরুক গে, কাঁদছে তো কাঁদুক গে, আমরা তার কি করব শুনি?

সুব্রতর মা রমা দেবী আসিয়া তিমিরবরণকে বলিলেন, ভাল বিপদ হয়েছে আমার। তখনই তো আমি কর্ত্তাকে বার-বার বলেছি যে, কাজ কি বাপু অচেনা অজানা ঘরে—তাও আবার দূরে—বিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমার কথা কি কারও কানে গেল! এখন দুর্ভোগ তো ভুগতে হবে আমাকেই। মেয়েটাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে আমার যেন হয়েছে জ্বালা! একে-ওকে ডাকতে গিয়ে তারই নামটা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। আমারও যেমন, আহা, মনটা যেন কেমন হ'য়ে গেছে! কে জানে, কেমন ঘরে পড়ল আবার —যে অভিমানী মেয়ে আমার! আবার ওটার জ্বালায় তো আমি আরও গেলুম।···লীনা, এখনও থাম্ বলছি বাপু, মেজাজ আমার বিগড়ে দিস নে। সেই তখন থেকে কান্না জুড়েছে, আমার হাড় না জ্বালিয়ে যেন ওদের সোয়াস্তি নেই।

রমা দেবী আর দাঁড়াইলেন না। ক্রন্দনরতা লীনাকেই বোধ করি শাসন করিতে চলিয়া গেলেন।

তিমিরবরণের কেন জানি হাসি পাইল। চমৎকার মানুষের বেদনা, আর আরও চমৎকার তাহার অভিব্যক্তি!

সুব্রত মহা বিরক্ত হইয়া তিমিরবরণকে নিজের ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া সশব্দে ঘরের দরজার খিলটা আঁটিয়া দিল।

কাব্যপাঠ করিয়া আনন্দ আহরণের চেষ্টা তাহাদের ব্যর্থ হইয়া যায়।

পৃথিবীর যাহা-কিছু সুন্দর তাহারই অন্তরে লুক্কায়িত আছে অব্যর্থ ব্যথাশর—আঘাত তাহার অনিবার্য্য। সে আঘাত তাহাদের সহ্য করিতেই হয়।

তিমিরবরণ সুব্রতর নিকট বিদায় লইয়া রমা দেবীর সঙ্গে দেখা করিয়া বিকালের দিকে যখন তাহাদের বাড়ি হইতে যায় তখনই ঠিক সুব্রতদের বাড়ির দুইখানা বাড়ির পরের বাড়ি হইতে একটা শোকরোল শুনিতে পায়। সমস্ত অন্তর তাহার নিমেষে স্পর্শ করিয়া সে শোকরোল ঝঙ্কারিত হইয়া উঠে, মুহূর্ত্তে সে এই সহসা-সমুত্থিত শোকরোলের কারণ বুঝিতে পারে। সুব্রতর বোন মিনা এবং বাড়ির আর সকলের কাছেও সে ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিল যে কল্যাণীর স্বামীর টাইফয়েড. দিন-দিন খারাপের দিকেই চলিয়াছে। কল্যাণী মিনার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হইবে হয়ত। মিনা কল্যাণীর বিশেষ অন্তরঙ্গ ছিল। তাহার কাছেই তিমিরবরণ কল্যাণীর সংসারের সুখ-দুঃখের অনেক কথা শুনিয়াছে এবং এত বেশি শুনিয়াছে যে, কল্যাণীর সহিত তাহার নিজের কোন পরিচয় না-থাকা সত্ত্বেও তাহাকে আর অপরিচিতা মনে হয় না। মিনার কাছে কল্যাণীকে একদিন সে আসিতেও দেখিয়াছিল। সেদিন কল্যাণীর মুখ সে ভাল করিয়া না দেখিয়া থাকিলেও তাহার কেমন জানি একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ও মুখ সে আর কোথাও অপ্রত্যাশিতভাবে দেখিলেও চিনিয়া লইতে পারিবে। মিনার চোখে কল্যাণীর সমাদর ছিল, তিমিরবরণের কাছে তাই কল্যাণী ছিল অচেনা-আপন। সেই কল্যাণীরই বুঝি আজ কপাল পুড়িল।

তিমিরবরণ মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া সুব্রতদের বাড়ির বাহিরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহার কানে আসিল বাড়ির ভিতর হইতে রমা দেবীর বিচলিত কণ্ঠের ডাক, সুব্রত! সুব্রত! একবার ছুটে যা—

তিমিরবরণ আর সেখানে দাঁড়াইল না। দিগন্ত বিধুর করিয়া তখন কান্নার রোল উঠিয়াছে ··

রাস্তার মোড়ে আসিয়া তিমিরবরণ একটু চম্‌কাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। দক্ষিণ্ দিকের ফুটপাত ধরিয়া একটা লোক চলিয়াছিল ধীর মন্থর গতিতে। তিমিরবরণ সহজেই তাহাকে চিনিতে পারিল, যদিও চিনিবার মত চেহারা তাহার এখন আর নাই। দল-বাহারীর জমিদার-বাড়ির ছেলে সে। তিমিরবরণ একটু পা চালাইয়া তাহারই কাছে আগাইয়া গিয়া বলিল, নন্তবাবু যে!

নন্তবাবু সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তারপরে ক্ষণিক বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তিমিরবরণের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, তুমি সেই তিমিরবরণ তো? পাঁচ-ছ বছর আগে যেন তোমাকে দল-বাহারীতে একবার দেখেছিলাম ব'লে মনে হয়? তোমাদের বাড়ি-ঘর-দোর কিছু আর সেখানে এখন নেই বুঝি? আর থাকবে কি—জমিদারের কবলে গেছে তো—তা ভালই হয়েছে। আজ জমিদারেরই বা থাকল কি শুনি— সব গেছে। পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে গেছে। আর ও কিছু থাকবার জিনিসও নয়।

জমিদারির অবশিষ্ট যা আমার হাতে এসে পড়েছিল তা এই দু-বছরেই ফুঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি। বাঁচা গেছে!

তিমিরবরণ একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, বলেন কি, অত বড় জমিদারি এরই মধ্যে নিঃশেষ হ'য়ে গেল!

নন্তবাবু হাসিয়া বলিল, হুঁ, তা গেল তো দেখলাম চোখের সাম্‌নেই— আর নিজের হাত দিয়েই তো গেল! আর না যাওয়ার কারণও তো কিছু ভেবে পাই না!

তিমিরবরণ তাহারই সঙ্গে পথ চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কি আপনাদের জমিদারির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই?

নন্তবাবু বলিল, অবশিষ্ট এখন দেনা আর আমি।

তিমিরবরণ জিজ্ঞাসা করিল, এখন আপনি আছেন কোথায়? আর চলছেই বা আপনার কেমন ক'রে?

নন্তবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, তা চলছে এক রকম কিছু না ক'রেই। এককালে পয়সা ছড়িয়েছিলাম তারই সুদে। অপরের অনুকম্পায়ই দিন কাটছে এখন। আবার কোন্‌দিন হয় তো দেবে তাড়িয়ে —ভিক্ষের ঝুলি হাতে বেরিয়ে পড়ব পথে। জীবনে দেখা হ'ল সবই—এই যা লাভ! তবে দুঃখ আমি করি না তিমির, কারণ ও ক'রে কোন লাভ নেই। তবে মানুষ যখন আমাকে ঘৃণা করে তিমির, তখন কি জানি কেন দুঃখ পাই। জানি না, তুমিও এরই মধ্যে আমাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছ কিনা।

তিমিরবরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, আপনাকে ঘৃণা করবার মত কোন কারণ তো আমার ঘটে নি নন্তবাবু। খামকা একটা লোককে ঘৃণা করার কোন মানে হয় না যে! এককালের দল-বাহারীর জমিদার আপনি—আপনার জন্যে বড়জোর দুঃখ বোধ করতে পারি, কিন্তু ঘৃণা করব কেন?

—না, অনেকে করে, তাই—বলিয়া নন্তবাবু একটি গলির দিকে বাঁকিয়া বলিল, আচ্ছা, আসি তা'হ'লে তিমির। আমার এদিকেই যেতে হবে।

তিমিরবরণ হাত তুলিয়া নমস্কার জানাইয়া দল-বাহারীর ভূতপূর্ব্ব জমিদার নন্তবাবুর কাছে বিদায় লইয়া নিজের হোটেলের দিকেই চলিল।

তিমিরবরণ নন্তবাবুর কথা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতেই পথ চলিতেছিল। সহসা রাস্তার একটা দোকানের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেল। ভিড়ের মধ্যে একটি লোক দাঁড়াইয়াছিল—তাহার কপালের উপর রক্তের দাগ এবং তাহাকে ঘিরিয়াই জনতা। দুই-এক কথায় কথায় তিমিরবরণ ব্যাপারটা কতকটা জানিয়া লইয়া আবার পথ চলিতে লাগিল। ব্যাপারটা এইরূপ,—আহত লোকটির সঙ্গে এক জনের বহুকালের শত্রুতা ছিল। সে এতদিনে কেবল সুযোগ খুঁজিয়াছে

তাহাকে জব্দ করিবার। আজ সহসা তাহাকে রাস্তায় পাইয়া একটা মিথ্যা চুরির অপবাদ দিয়া দুই ঘা মারিতেই রাস্তার লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার সহায়তা করিয়াছে। চোরের উপযুক্ত সাজা হইয়া যাওয়ার পরে জানা গেল, চোর সে মোটেই নয় এবং দেখা গেল, চোরের আবিষ্কর্ত্তা নিরুদ্দেশ। সমাগত জনমণ্ডলী তখন নিরপরাধ লোকটির জন্য অনুকম্পা জানাইতেছিল এবং সত্যকার অপরিচিত আসামীর উদ্দেশ্যে মনের ক্ষোভ মিটাইয়া যথেচ্ছ গালিগালাজ করিতেছিল।

তিমিরবরণ হোটেলে ফিরিয়া চিঠির ব্যক্স খুলিয়া নিজের নামে দুইখানি চিঠি আছে দেখিয়া তাহা লইয়া উপরে উঠিতে যাইতেছিল, এমন সময় হোটেলের ম্যানেজার অধরবাবু বলিলেন, তিমিরবাবু, আপনার কাছে দু-বার ক'রে আপনার সেই কবিবন্ধুটি এসেছিলেন এবং আর কিছু পরেই আবার আসবেন জানাতে ব'লে গেছেন। আপনাকে তার নাকি আজ পাওয়াই চাই, নইলে তাঁর ভয়ানক ক্ষতি হ'য়ে যাবে।

তিমিরবরণ উপরে উঠিয়া গেল।

ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া রাস্তার দিকের দরজাটা দিয়া ক্ষণেক চল-চঞ্চল রাস্তার পানে অলস দৃষ্টি ফেলিয়া নিজের চৌকির উপর আসিয়া বসিয়া চিঠি দু'খানি পড়িতে লাগিল।

একখানি একটি মাসিক পত্রের সম্পাদকের নিকট হইতে আসিয়াছে, অপরখানি লিখিয়াছে তাহারই এক বন্ধু শিলং হইতে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন,—তিমিরবাবু, আমাদের কাগজের অবস্থা তো আপনার অজানা নাই, কাজেই আপনি আপনার গল্পের জন্য পারিশ্রমিক না-চাহিয়া কোনও ভাল গল্প যদি অবিলম্বে পাঠাইয়া দেন তো বিশেষ বাধিত হইব। ইত্যাদি।

শিলং হইতে বন্ধু লিখিয়াছে,—হঠাৎ সেদিন একখানি মাসিকপত্র আসিয়া হাতে পড়িল. তোমার 'অরণ্যের ব্যথা' গল্পটি তাহাতে বাহির হইয়াছে।

পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার সব গল্প পড়িতে পাই না বলিয়া দুঃখ হয়। তুমি যদি তোমার গল্প প্রতি মাসে যে যে কাগজে বাহির হয় তাহার একখানা করিয়া কাপি আমাকে পাঠাইয়া দাও তো আমার পড়া হইতে পারে। এটুকু কষ্ট আমার জন্য স্বীকার করিবে নিশ্চয়। ইত্যাদি।

তিমিরবরণ বিরক্ত হইয়া চিঠি দুইখানি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপরে হোটেলের চাকর শঙ্কুকে ডাকিয়া এক কাপ চায়ের অর্ডার করিল এবং ফিরিয়া দেখিল, তাহার কবিবন্ধু পার্থ আসিয়া পড়িয়াছে। শঙ্কুকে আবার ডাকিয়া তিমিরবরণ দুই কাপ চায়ের কথাই জানাইয়া দিল।

পার্থকে ঘরে আনিয়া বসাইয়া তিমিরবরণ বলিল, তুই নাকি এরই মধ্যে দু-বার এসে আমায় খোঁজ ক'রে গেছিস্? কেন, আমাকে তোর এত দরকার কিসের?

পার্থ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল, তোকে আমার দরকার নয়, দরকার আমার টাকার। আজ যদি টাকা কোথাও না পাই তো কাল থেকে সব উপোসী থাকতে হবে। তার পরে আবার ছোট বোনটার কাল থেকে জর দেখা দিয়েছে, না জানি টাইফয়েডেই দাঁড়িয়ে যায়। একে একে সব সম্পাদকের দরজাতেই গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু আমার দশটা কবিতা কেউ দশ টাকা দিয়েও কিনতে রাজি হ'ল না। ইচ্ছে হ'ল, ঘরে ফিরে কবিতাগুলো সব ছিঁড়ে ফেলি। এর চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে চাইলেও যে এতক্ষণে দশটা টাকা রোজগার হ'তে পারত। অথচ, পার্থ সেন নাকি আবার ভাল কবিতাও লেখে—তার নাম থাকলে নাকি আবার কাগজও বিকোয়—আবার সম্পাদকের তাগিদেও তাকে অস্থির হ'তে হয়। চমৎকার কিন্তু!

তিমিরবরণ পার্থের হাতে সম্পাদকের ও তাহার শিলং-এর বন্ধুর চিঠি

দুইখানি ঘরের মেঝে হইতে তুলিয়া দিয়া বলিল, এ চিঠি দু-খানা প'ড়ে দেখ্। আর তোর কত টাকার দরকার এখন শুনি ?

পার্থ বলিল, দুটো— চারটে যা তুই দিতে পারিস্ তাই আমার দরকার।

তিমিরবরণ বলিল, চারটে পর্য্যন্ত দেবার মতই আমার আছে, তার বেশি আজ আর দিতে পারব না।

পার্থ বলিল, ঐ হ'লেই যথেষ্ট হবে।

শঙ্কু আসিয়া চা দিয়া গেল। পার্থ চা পান করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কই, দে তবে, আজ আর বসবো না। তুইও তো পড়াতে বেরুবি একটু পরেই। পারিস তো আসছে র'ব্বার একবার আমাদের বাড়ি যাস্। মা তোর কথা বলছিল আজও। তিমিরবরণ টাকা বাহির করিয়া পার্থের হাতে দিয়া বলিল, কলেজ থেকে ফেরার পথে পারি তো কাল একবার যাব'খন।

—যাস্ কিন্তু। বলিয়া পার্থ চলিয়া গেল।

তিমিরবরণ তাড়াতাড়ি গিয়া রাস্তার দিকের বারান্দার রেলিঙের উপরে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। পার্থের কথাই সে ভাবিতেছিল। পার্থ চমৎকার কবিতা লেখে! পার্থের কবি-প্রতিভা সাধারণ নয়। কিন্তু পার্থ কি বিপদেই পড়িয়াছে! অতবড় সংসার তাহার একার ঘাড়ে। সংসারে বিধবা মা আছেন, একটি বিধবা বোন, দুইটি অবিবাহিতা বোন ও তিনটি ছোট ভাই। পার্থ কবি, কিন্তু দায়িত্বজ্ঞানহীন হইতে পারে নাই বলিয়াই তাহাকে এই সংসারের জন্য ছুটাছুটি করিয়া মরিতে হয়। হয়তো কবি-প্রতিভা তাহার একদিন এই দুঃখদৈন্যের মধ্যেই সমাধি লাভ করিবে। হয়তো সে কোনও এক সওদাগরী অফিসের এক কোণে অলক্ষিত থাকিয়া কলম পিষিয়া যাইবে সারা জীবন।

তিমিরবরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখিল,

পার্থ একটা বাস্-এর পিছন দিয়া সাবধানে রাস্তা পার হইয়া ওপাশের ফুটপাত ধরিয়া বাড়ির দিকে হাঁটিয়া চলিয়াছে। পার্থ কবি-হিসাবে এই স্বল্পকাল মধ্যেই বেশ নাম করিয়াছে, হয়ত রাস্তার লোক আঙুল তুলিয়া তাহাকে দেখাইয়া অপরের কাছে তাহার পরিচয়ও দিয়া থাকে।

একে একে রাস্তার আলোগুলি জ্বলিয়া ওঠে, রাস্তার রূপ বদলাইতে থাকে। তিমিরবরণ ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আবার পড়াইতে বাহির হইয়া যায়। রাত্রে সে দুই ঘণ্টার জন্য একটি ছাত্রী পড়ায়। তাহার ছাত্রী অমিতা থার্ড ক্লাসে পড়ে।

তিমিরবরণের এবেলাও আবার সেই ভয় হয়। কি জানি, ছাত্রীর পিতা, কি সে-বাড়ির অন্য কেহ যদি তাহার এই দুই দিন কামাইয়ের জন্য কিছু বলিয়া বসে।

শঙ্কিত হৃদয়ে সে ছাত্রীর পড়ার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। অমিতা তখন নিজের চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরকার একখানি খোলা বইয়ের পাতার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ছিল, আর তাহারই অল্প দূরে তিমিরবরণের চেয়ারে কে এক জন অপরিচিত যুবক অমিতার বইয়ের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া ছিল।

তিমিরবরণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাই একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার আগমন অমিতা টের পায় নাই, সেই অপরিচিত যুবকটিই প্রথম টের পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কা'কে চাই?

অমিতা চেয়ারে চকিতে পিছন ফিরিয়া চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আঃ, উনিই তো আমার আগের মাষ্টারমশাই। তারপরে তিমিরবরণকে বলিল, মাষ্টারমশাই, আপনি ওঘরে গিয়ে একটু বসুন, বাবাকে আমি ডেকে দিচ্ছি। বাবার সঙ্গে দেখা না ক'রে যাবেন না যেন।

তিমিরবরণ অমিতার পিতা জ্ঞানবাবুর সঙ্গে দেখা করার আর কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ করিল না।—কিন্তু অমিতা কথা শেষ

করিয়াই নিমেষে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল দেখিয়া তাহার পিতার সঙ্গে দেখা না করিয়া যাওয়াটাকে সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ হইবে বলিয়া মনে করিল। কাজেই পাশের ঘরের উদ্দেশ্যেই সে পা বাড়াইল। অপরিচিত যুবকটি সহসা তিমিরবরণকে প্রশ্ন করিল, আপনারই নাম বুঝি তিমিরবরণবাবু? আপনি গল্প-টল্পও লিখে থাকেন বুঝি? অমিতাকে আপনি ক'বছর পড়িয়েছেন? ও তো কিছুই জানে না দেখছি। এতদিন পাস করেছে যে কি ক'রে তাও তো ভেবে পাই না।

তিমিরবরণ তাহার প্রশ্নগুলির একটিরও উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন বোধে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে নীরবে চলিয়া গেল।

জ্ঞানবাবু কতকটা অপ্রতিভের মত আসিয়া তিমিরবরণের কাছে দাঁড়াইলেন।

তিমিরবরণ যেন লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিল। ভাল করিয়া সে জ্ঞানবাবুর মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পর্যন্ত চাহিতে পারিল না।

জ্ঞানবাবু বলিলেন, তিমির, ব্যাপারটা বড় বিশ্রী দাঁড়িয়েছে, এতে আমার কিন্তু কোনই হাত নেই। তোমার দু-দিন কামাই হয়েছে ব'লে যে তোমাকে আর রাখছি নে তা যেন মনে করো না। মানুষের শরীর যখন, তখন কামাই হওয়াটা আমি খুব দোষের মনে করি নে, আর তোমার মত কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন ছেলের পক্ষে। যাক্ সে কথা, এখন যা হয়েছে তাই বলি। এই যে অমিতার নূতন মাষ্টার—এটি আমার শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে কি যেন লতায় পাতায় জড়িয়ে কি একটা হয়। গ্রাম থেকে এখানে এসেছে একটা চাকরির সন্ধানে—অবস্থা নাকি খুবই খারাপ। আমার স্ত্রীর অনুরোধে তাই এত বড় অপ্রিয় কাজও আমাকে করতে হ'চ্ছে। অকারণে এই যে তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে হ'চ্ছে এর জন্যে আমার চেয়ে বোধ করি কেউ বেশি দুঃখিত বা লজ্জিত হয় নি। দু-দিন পরে একবার

এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো, তোমার মাইনে যা এ ক'দিনের হিসেবে পাওনা হয় তা আমি বুঝিয়ে দেব।

তিমিরবরণ বিদায় লইয়া রাস্তায় নামিয়া আসিল। জ্ঞানবাবুকে একটা কথাও সে বলিয়া উঠিতে পারিল না এবং বলার প্রয়োজন ছিল বলিয়াও সে অনুভব করিল না। পথে সে সমস্ত ব্যাপারটা একবার আদ্যোপান্ত ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। একটা সহজ অনুকম্পায় হৃদয় তাহার ভরিয়া উঠিল ;—সে যে নিজের জন্য, না জ্ঞানবাবুর জন্য তাহাও সে ভাল করিয়া ধরিতে পারিল না। তারপরে জোর করিয়া একবার সে সমস্ত ভুলিতে চেষ্টা পাইল, কিন্তু সম্ভব নয় জানিয়া সে রাস্তার দুই পাশের সব জিনিসই একান্তভাবে দেখিতে লাগিল এবং চিন্তা সেই দিকেই চালিত করিতে প্রয়াসী হইল।

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তিমিরবরণ আলো জ্বালিল এবং আবার তাহা নিবাইয়া দিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। একান্তে অন্ধকারে চিন্তা যেন তাহার আরও সর্ব্বগ্রাসী হইয়া উঠিল। চোখের পাতা আর তাহার বুঁজিতে পাইল না। নিখিল পৃথিবীর বেদনা যেন আজ তাহার কাছে মূর্ত্তি পাইবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইতেছে। রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র হইতে সামান্য বনের বানর, মহাভারতের ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-যুধিষ্ঠির হইতে তৃণাদপি যে তৃণ, সকলের ব্যথা-সমুদ্র তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ, পুরাণ-ইতিহাসময় ঘুরিয়া মরিতেছে কত মানুষের দীর্ঘশ্বাস, তারপরে আজিকার এই পৃথিবী—চিরদিনের সেই ব্যথা-তীর্থ—আজিও সেই ব্যথা-তীর্থই রহিয়া গিয়াছে। যুগে যুগে তাই শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রীচৈতন্য আসিয়াছেন এ মহাতীর্থে—নর-নারীর অশ্রু মুছাইতে নয়, কমণ্ডলু পূর্ণ করিয়া লইতে তাহাদের অশ্রুতে। কিন্তু সে তো পূর্ণ হইবার নয়—যুগে যুগে মানুষ অশ্রু ডালি দিয়াই চলিয়াছে, চলিবেও অনন্তকাল ধরিয়া, তবু সে-কমণ্ডলু কোনদিন পূর্ণ হইবে না।...

তিমিরবরণ আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া বসিল। ঘরের আলোটা আবার জ্বালিল। সেদিনের অসমাপ্ত গল্পটা আবার চোখের সামনে মেলিয়া ধরিল। ঠিক করিল, আজ রাত্রের মধ্যেই এ গল্পটা শেষ করিয়া ফেলিতে হইবে। গল্পটা যতদূর লেখা হইয়াছে—১মবার হইয়াছে। শেষটা সে ঠিক যেন মনের মত করিয়া আর শেষ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু যদি একবার শেষটা কোনরকমে মনের মত হইয়া যায় তো এ গল্পটি তাহার সমস্ত গল্পের শ্রেষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে।

পৃথিবীর ব্যথা-মূর্ত্তি এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহার এই গল্পে—শুধু শেষের সেই সোনালী রেখাটা যথাস্থানে টানিয়া বসাইয়া দিতে পারিলেই যেন সৃষ্টির শেষকথা চরম করিয়া তাহার বলা হইয়া যায়। নিজের সামান্য ব্যথা ভুলিতে তাই সোনালী রেখার সন্ধানেই সে পৃথিবীর আদি-অনন্ত খুঁজিয়া ফেরে —কল্পনাকে দিগ্-দিগন্তে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানে বিস্তৃত করিয়া দেয়। সোনালী রেখা আর ধরা না দিয়াই যেন পারে না।

রাত হইয়া যায় দেখিয়া হোটেলের চাকর শঙ্কু আসিয়া দরজায় ধাক্কা দেয়। তিমিরবরণের চমক ভাঙে। উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলে, শঙ্কু, ঠাকুরকে আমার রাত্রের খাবার এখানেই দিয়ে যেতে বল্, ওখানে আর যেতে পারি নে।

আহারাদির পর তিমিরবরণ আবার একবার রাস্তার দিকের বারান্দাটার রেলিঙে ভর দিয়া গিয়া দাঁড়ায়। ঘরে আলো জ্বলিতে থাকে, খাতাটাও বিছানার উপর খোলা পড়িয়া থাকে, আর কলমটাও খাতার 'পরেই খোলা থাকে। রাস্তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্তি ঘনাইয়া আসে, চিন্তায় চিন্তায় মস্তিষ্ক জড় হইয়া আসে, হঠাৎ গল্পের সে কি নাম দিবে তাহা ঠিক হইয়া যায়। রাত্রের পৃথিবীর পানে চাহিয়া বহুদিনের ভাবা সেই কথাই তাহার মনে হয়, এই সেই ব্যথা-তীর্থ! গল্পের নাম হইবে তাহাই। তিমিরবরণ অনেকটা স্বস্তি অনুভব করে, কিন্তু শেষের সেই রেখাটা যে আর কিছুতেই

ধরা দিতে চাহে না। কত ভাবেই তো শেষ করা যাইতে পারে, কিন্তু যাহা না হইলেই নয়, এমন যে শেষের টান সে টানটা ঠিক সে বসাইয়া দিতে পারিতেছে কোথায় ?

দেহের ক্লান্তি শেষে জয়লাভ করিল। তিমিরবরণ আপনার অজ্ঞাতে কখন সুগভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া গেল। ঘরের আলো তেমনই জ্বলিতে লাগিল, খাতা ও কলম মাথার কাছে খোলাই পড়িয়া রহিল এবং রাস্তার দিকের দরজাটাও খোলা রহিল। এমন তাহার জীবনে বহু রাত্রিই কাটিয়াছে।

তিমিরবরণ আপনাকে প্রকাশ করিতে না পারার যে-বেদনা লইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুমের মধ্যেও সে-ব্যথার মৃত্যু হয় নাই।

ভোরের দিকে সে তাই হয়ত স্বপ্ন দেখিল, এক বিরাট পুরুষ, অবর্ণনীয় তাঁহার মূর্ত্তি, কোটি কোটি মানবশিশুকে এক সিংহদ্বার দিয়া বাহির করিয়া দিয়া সিংহদ্বারের প্রহরীকে ইঙ্গিতে দ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া মানব-শিশুদের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, এই তোমাদের সেই কাম্যতীর্থ, এই সেই ব্যথা-তীর্থ! নির্ভয়ে তীর্থপথের পথিক হইয়া বাহির হইয়া পড়, পশ্চাতে ফিরিবার অধিকার হইতে তোমরা বঞ্চিত।

তিমিরবরণ সহসা অস্থির চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, এই কোটি কোটি মানবশিশুদের আবার যাহাতে ফিরিবার অধিকার দেওয়া হয় ঐ সিংহদ্বারের ভিতরে, বিরাট পুরুষের কাছে সেই আবেদন জানায়, কিন্তু সিংহদ্বার তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে, বিরাট পুরুষ শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছেন। তিমিরবরণ শুধু আন্তরিক বিক্ষোভ মিটাইতে যেন হতাশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিষ্ঠুর! জীবন লইয়া একি ছিনিমিনি খেলিতেছ! ব্যথা-গরল পান করিয়া নিজে তো নীলকণ্ঠ সাজিয়াছ, তবু কি তোমার লীলাকৌতুকের শেষ নাই!

তিমিরবরণ জাগিয়া উঠিল। তখনও ভোরের আলো দেখা দেয় নাই।

রাস্তার দিকের বারান্দাটিতে সে আসিয়া দাঁড়াইল। বাহিরের পৃথিবী তখন নিষ্প্রাণ, নিষ্পন্দ। তিমিরবরণ স্বপ্নের কথাই ভাবিল। তাহার অসমাপ্ত গল্পের সে শেষ খুঁজিয়া পাইয়াছে। কোটি কোটি নবাগত মানবসন্তান ···বিরাটপুরুষের সেই ব্যথা-তীর্থ চিনাইয়া দেওয়া .. এই তো চমৎকার সমাপ্তি! ..গল্প তাহার ব্যথা-তীর্থেরই মত চিরন্তন হইয়া থাকিবে। নিজে সে নীলকণ্ঠ সাজিবে —গরলে গরলে কণ্ঠ তাহার পূরিয়া যাক, নীল হইয়া উঠুক, নহিলে আর তৃপ্তি নাই!

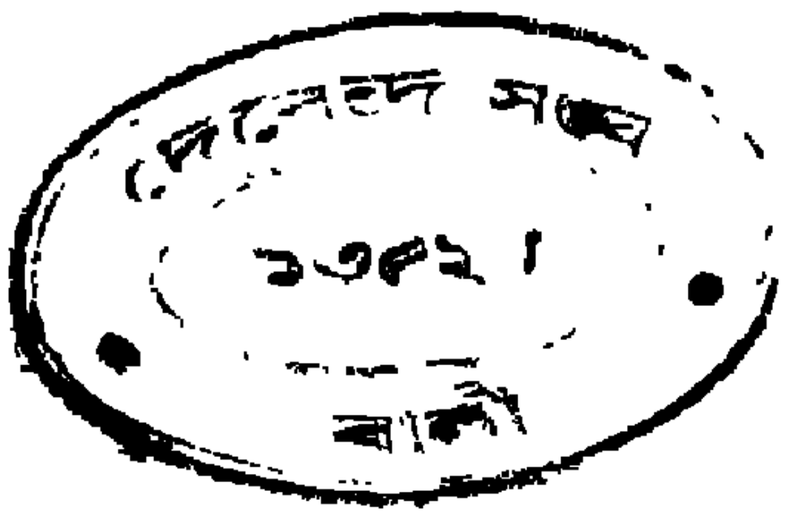

ছোরা

চতুর্দ্দিকে জল, মাঝে একটা বিরাট ডাঙ্গা জাগিয়া আছে। এই ডাঙ্গার উপরে দুই সারিতে দশ বারোটি দোকান ঘর—স্থায়ী বন্দোবস্তই তাহাদের, আর অস্থায়ী বহু দোকান ঘরই শৃঙ্খলবিহীনভাবে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে এত জলের মধ্যে ডাঙ্গাটি দোকান ঘর, গাছপালা প্রভৃতি লইয়া এমনভাবে ভাসিতেছে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন বিরাট একটা কচ্ছপ জলের উপর খোলাটি তাহার জাগাইয়া রাখিয়াছে। অবশ্য, বহুদূর হইতে দেখিলেই সেকথা মনে হয়, কাছে আসিলে কিন্তু সে-সব কথা মনে হওয়ার অবকাশই আর থাকে না। কারণ, অর্জ্জুনপুরের হাট বলিয়া সকলেই তাহাকে চিনিতে পারে। তাহা সে ভরপুর জমা অবস্থায় দেখিলেও চেনা যায়, আবার শূন্য জন-মনুষ্যহীন অবস্থায়ও নির্ভুল চিনিয়া লওয়া যায়।

বর্ষা যে বৎসর একটু বাড়াবাড়ি শুরু করে সে বৎসরই শুধু অর্জ্জুনপুরের হাটের কাণায় কাণায় জল ভরিয়া ওঠে। এ বৎসর একেবারে হাটের উপর একপাশে জল উঠিয়া পড়িয়াছিল, তিন-চারদিনেই আবার তাহা নামিয়া গেছে। বিশেষ কোন অসুবিধায় কাহারও পড়িতে হয় নাই। সপ্তাহে দুইদিন হাট রীতিমতই জমিয়াছে।

অর্জ্জুনপুর গ্রামের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে এই হাট। গ্রাম হইতে একেবারেই ইহা যেন বিচ্ছিন্ন, কোন সম্পর্ক আছে বলিয়াই মনে হয় না। কারণ, অর্জ্জুনপুরের ঘর-বাড়ি যেখানে আসিয়া শেষ হইয়াছে সেখান হইতে হাটের চিহ্ন খুব অস্পষ্ট হইয়াই চোখে পড়ে,—মাঝে শুধু বহুদূর বিস্তৃত

ধানক্ষেত, বর্ষাকালে তাহা প্রায় জলমগ্ন থাকে। হাটের অপর সব দিকের প্রথম গ্রাম যেন সব আকাশে মিশিয়াছে একটি ধূসর রেখার মত—মাঝে দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত জল-রাশি। বর্ষার বিপুল সমারোহে দিগ্-দিগন্ত উচ্ছল আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

রবিবার। অর্জ্জুনপুরের হাট জমিয়াছে। হাটের চতুঃসীমা নানাপ্রকার নৌকায় ছাইয়া গেছে। নৌকার বাঁশের লগিগুলি শূন্যে মাথা তুলিয়া আছে। ঠেলা-ঠেলি হৈ-চৈ-হল্লা সোরগোল পড়িয়া গেছে। চতুষ্পার্শ্বে মাইলব্যাপী একটা একটানা কলরব জাগিয়া উঠিয়াছে। নৌকার আসা-যাওয়ায় জল উচ্ছল কলধ্বনি করিয়া উঠিতেছে। বিরামহীন সে কলধ্বনি আর কলরব। দিগ্-দিগন্ত মুখর হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম দিগন্তশায়ী সূর্য্যের রক্তিমাভা হাটের উপর আসিয়া আকুল হইয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে এবং উচ্ছ্বসিত জলে নামিয়া পড়িয়া নানা বর্ণচ্ছটায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। চতুর্দ্দিকে আলোড়ন ও আলোক বিচ্ছুরণে অপূর্ব্ব শোভা জাগিয়াছে।

হাটে আর লোক ধরে না—এত লোকের ভিড় হইয়াছে। অর্জ্জুনপুরের হাট একেবারে গম্ গম্ করিতেছে।

অর্জ্জুনপুরের হাট এতদঞ্চলের মধ্যে বিশিষ্ট হাট, আর অর্জ্জুনপুরের মাধব ঠাকুরও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। নাম ডাক তাহারও খুব আছে। তবে অর্জ্জুনপুরের কোন ভাল কাজের সঙ্গেই তাহার নাম যুক্ত হইয়া নাই এবং মন্দ কাজের সঙ্গেও স্পষ্টভাবে কেহ তাহার নাম যোগ করিয়া না দিলেও ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে না। মানুষের সন্দেহের ভিতর দিয়াই মাধব ঠাকুর তাহার ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। লোকে তাহাকে বেশ ভাতির চক্ষেই চিরদিন দেখিয়া আসিতেছে। মাধব ঠাকুরের সত্য স্বরূপ গোপন থাকা সত্ত্বেও লোকের মনে সে গভীর রেখাপাত করিয়াছে।

মাধব ঠাকুরও হাটে আসিয়াছে। সঙ্গে তাহার প্রিয়শিষ্য ও বন্ধু

প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ অষ্টপ্রহর মাধব ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। মাধব ঠাকুরকে বাদ দিয়া প্রিয়নাথের কথা কেহ কখনও তাই ভাবিতে পারে না।

প্রিয়নাথই প্রথম লক্ষ্য করে এবং সমস্ত কিছু ভুলিয়া গিয়া মাধব ঠাকুরের হাত ধরিয়া টানিয়া নিয়া ভিড়ের মধ্যে বকুল গাছটার কাছেই দাঁড় করাইয়া দিয়া বলে, ঠাকুর. আবার এ বছরও এসেচে দেখো, এই সেই বেদের দল, কেমন কিনা? ঠিক চিনেচি আমি—ঐ সেই খুনে মেয়েটা। ঠিক চিনেচি, ভুল আমার হ'তেই পারে না। ওর চোখ দুটো দেখলেই আমি ঠিক চিনতে পারি।

বলিয়া প্রিয়নাথ স্থির দৃষ্টিতে তিনটি মেয়ের মাঝের মেয়েটির পানে চাহিয়া থাকে। মেয়েটি একবার দৃষ্টি তুলিয়াই আবার তাহা নামাইয়া নেয়।

তিনটি বেদিনী মেয়ে পাশাপাশি বসিয়া খেল্‌না. চুড়ি, কাঠের বাসন-কোসন—কত কিছুই বিক্রয় করিতেছে। তাহাদের পিছনেই ঠিক বকুল গাছের গায়ে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একটি বেদিয়া যুবক তাহাদের তদারক করিতেছে। প্রিয়নাথ যে মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া কথাগুলি বলে সে-মেয়েটিরই বয়স তিনটি মেয়ের মধ্যে একটু বেশি। তাহার ভঙ্গিমায় সামান্য একটু জড়তা যেন জাগিয়া মাধুর্য্য ভরিয়া দিয়াছে। লোকজনের দৃষ্টি তাহারই প্রতি নিবদ্ধ। হাটের মাঝে ভিড়টা সেখানেই যেন একটু বেশি হইয়াছে। রীতিমত ঠেলাঠেলি শুরু হইয়া গেছে।

মাধব ঠাকুর ভিড় ঠেলিয়া একটু আগাইয়া পড়িয়া প্রিয়নাথকে কাছে টানিয়া নিয়া বলে, হাঁরে প্রিয়, খুবতো চোখ তোর! ঠিকই চিনেচিস্।

হুঁ, ঠিক!

প্রিয়নাথ অমনি সেখানে খেল্‌নার সামনে বসিয়া পড়িয়া বলে, দাঁড়াও ঠাকুর. খেল্‌নার দর করি একটু। হাট না হয় পরেই হবে'খন.

খাসা সব খেল্‌না এনেচে এ বছর। কই, বাছো না ঠাকুর, একটা পছন্দ ক'রে দাও।

মাধব ঠাকুর খেল্‌নার পানে না চাহিয়াই বলে, নে না প্রিয়, বড়টাই ওর মধ্যে বেছে নে না।

মাধব ঠাকুর কথা শেষ করিতে না করিতেই প্রিয়নাথ হাসিতে শুরু করিয়া দেয়। তাহার হাসি শুনিয়া মাধব ঠাকুরও বিব্রত হয়। প্রিয়নাথ হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে পড়ে হইয়া খেল্‌নার মধ্যে হাত রাখে।

বেদিয়াদের মধ্যে বড় মেয়েটি মুখ গম্ভীর করিয়া প্রিয়নাথের হাতটা ধরিয়া খেল্‌নার উপর হইতে আল্‌গোছে সরাইয়া রাখিয়া বলে, নাও, হাত সরাও, খেল্‌না আর কিনতে হবে না। এখন ভিড় ভাঙ্গো এখান থেকে বলচি।

পরিষ্কার করিয়াই সে কথা বলে। কোথাও এতটুকু তাহার বাধে না। প্রিয়নাথকে যেন সে কত চেনে এমনভাবেই কথা বলে। বেদিয়া মেয়ের নিটোল সুন্দর মুখে বিরক্তিকর ভ্রুকুটি জাগে।

মাধব ঠাকুর চট্‌ করিয়া প্রিয়নাথের একটা হাত ধরিয়া তাহাকে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলে, ওঠরে প্রিয়, ঢের হয়েছে, খেল্‌না আর কেনে না। তোকে তো চিনেচে ঠিক।

প্রিয়নাথ মেয়েটির রক্তাভ মুখের পানে চাহিয়া অকারণ উচ্ছ্বাসে হো হো করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া ওঠে।

মাধব ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া ভিড়ের মধ্যেই টানিয়া নিয়া সরিয়া যায়। সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া প্রিয়নাথকে সে বলে, তুই হৈ হৈ ক'রে সব মাটি ক'রে দিলি। একটু একটু ক'রে জমাবি —তা না, একেবারে গিয়েই হি হি ক'রে হাসতে শুরু ক'রে দিলি। লোকে ভাবলে কি বলতো?

প্রিয়নাথ বলে, ভাবুকগে! কিন্তু ওদের নৌকাটা ওরা কোনখানে লাগিয়েচে সেটা দেখে রাখতে হয় তো?

মাধব ঠাকুর বলে, হ্যাঁ, সেইটেই বরং খুজে বের কর। হাট ভাঙ্গুক, তারপর দেখা যাবে।

তাহাই সাব্যস্ত হয়। উভয়ে প্রায়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু মন তাহাদের বেদিয়াদের নৌকার কথাই চিন্তা করিতে থাকে।

গত বৎসর বর্ষার সময় এমনই এই বেদিয়া দল অর্জ্জুনপুরের হাটে আসিয়াছিল। সপ্তাহখানেক মাত্র অর্জ্জুনপুরের হাটের গায়ে নৌকা লাগাইয়া তাহারা ছিল। হাটের দিন হাটেই দোকান সাজাইয়া বসিত এবং অন্যান্য দিন গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রতি বাড়ির ঘাটে ঘাটে নৌকা লাগাইয়া জিনিসপত্র ফিরি করিয়া বেড়াইত।

বেদিয়াদের এই তিনটি মেয়ের সঙ্গে একজন বৃদ্ধা সর্ব্বদাই থাকিত, সে-ই লোকের সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কহিত, আর তাহারা তিনজন শুধু ঝাঁপি খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিয়া দেখাইত। বৃদ্ধা এবার সঙ্গে নাই, হয়তো মারাই গিয়াছে : কাজেই হয়তো ছেলেটি তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে নীরব অভিভাবক হিসাবে।

গত বৎসর হাটে যে কাণ্ড হইয়াছিল এই বেদিয়াদের নিয়া তাহা হয়তো এখনও কেহই ভুলিতে পারে নাই। একটা সামান্য অপরাধের জন্যই বেদিয়াদের বড় মেয়েটি অর্জ্জুনপুরের জমিদার বাড়ির ছোট তরফের ছোটবাবুর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে যুবক অবনীকুমারের হাতে এমন কামড় বসাইয়া দিয়াছিল যে, হাত পচিয়া নষ্ট হইয়া যাওয়ার জোগাড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ধনী লোকের সন্তান বলিয়াই হয়তো কলিকাতায় পাঠাইয়া ভাল চিকিৎসার দ্বারা হাতখানা বাঁচানো সম্ভব হইয়াছে। ছোটবাবু থানা-পুলিশ করিয়া ঐ বেদিয়া মেয়ে কৃশানুর কোনই শাস্তির

বিধান করিতে পারেন নাই, শুধু নিজ পুত্রের কলঙ্কটাই সর্ব্বত্র সুপ্রমাণ করিয়া আসিয়াছিলেন। অনেক টাকা ঢালিয়াও নাকি কোন ব্যবস্থাই হয় নাই।

অবনীকুমারের অপরাধ যথাযথই যে কি. তাহা আজিও গ্রামবাসী জানিতে পারে নাই। তাহাতে অবনীকুমারের সুবিধা কিছুই হয় নাই। চিকিৎসান্তে গ্রামে সে আর ফিরিয়া আসে নাই। কৃশানু তাই অর্জ্জুনপুরের সবারই প্রায় পরিচিত এবং সবারই তাহার প্রতি কেমন যেন একটা ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা বর্ত্তমান।

কৃশানুর রূপ-যৌবনের মধ্যাহ্ন সময় চলিতেছে। কৃশানু আবার সেই অর্জ্জুনপুরের হাটে আসিয়া খেল্না বেচিতে বসিয়াছে। ইহা দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়াই যেন পারে না। বেদিয়াদের খেল্না-চুড়ির দোকানে হাটের ভিড় যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সবারই লক্ষ্যবস্তু কৃশানু।

সমা হাট একটু একটু করিয়া ভাঙ্গিতে থাকে। সন্ধ্যা হইয়া আসে। দূর আকাশে একফালি বাঁকা চাঁদ ওঠে। জলে তাহার চাপা ধরণ জ্যোৎস্না ভাসিতে থাকে। হাটের গোলমালটা কেমন যেন ধরিয়া আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকে জলরাশি ঘরমুখী নৌকার বৈঠা ও লগির ঘায়ে বিক্ষুব্ধ বিচঞ্চল। জলে যেন একটা নূতন ধরনের শব্দ জাগিয়াছে। স্থায়ী দোকানগুলিতে আলো জ্বলিয়া ওঠে। অস্থায়ী দোকানের মালপত্র নৌকায় তোলা হইতেছে। দেখিলে মনে হয়, সব কিছুর সঙ্গে হাটও যেন গা ছাড়িয়া দিয়াছে। ভাঙ্গার মুখের ক্লান্তি অবসাদ জাগিয়াছে সর্ব্বত্র।

কৃশানু জিনিসপত্র ঝাঁপির মধ্যে তুলিয়া তাহার ডালাটি বন্ধ করিয়া টাকা পয়সা রাখার হাতে-বোনা সুতার থলিটি সবার চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া সানন্দে তাহাতে একটা ঝাঁকানি দিয়া গর্ব্বে ও উল্লাসে

বিধুর হইয়া ওঠে। বলে, প্রায় পাঁচ-সাত টাকার জিনিস আজ বিকিয়ে গেছে।

বলিয়া বেদিয়া যুবকটির হাতে থলিটি তুলিয়া দিতেই উঠিয়া দাঁড়ায়। যুবকটির হাতে তাহা তুলিয়া দিয়া স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে। তারপরে কোমরের কাপড়টা একটু আল্‌গা করিয়া দিতে গিয়াই একটা সামান্য শব্দে চকিত হইয়া পিছনে ফেরে। মাধব ঠাকুর ও প্রিয়নাথকে সে তাহাদের দিকেই আসিতে দেখে যেন। কৃশানু তাহাদের নাম অবশ্য জানে না, কিন্তু আজ বহুবার এই দুইটি লোককেই সে তাহাদের দোকানের সামনে দিয়া কারণে অকারণে ঘুরিয়া যাইতে দেখিয়া একটু সন্দেহযুক্ত হইয়াই মুখ ঠিক চিনিয়া রাখিয়াছে। অন্ধকারেও হয়তো সে তাহাদের নির্ভুল চিনিয়া লইতে পারিবে। লোক দুইটির চোখের প্রতি কৃশানুর যখনই চোখ পড়িয়াছে তখনই মনে তাহার কেমন জানি একটা শঙ্কা জাগিয়াছে, কি যেন একটা দুরভিসন্ধি লইয়া এই লোক দুইটি হাটে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এখনও হাটে তাহাদের দেখিয়া সন্দেহ তাহার নির্ভুল বলিয়াই মনে হয়। কৃশানুর সহসা মনে পড়ে—এই তো সেই অঞ্জনপুরের হাট। এখানেই তো গত বৎসর এমনই ভরপুর বর্ষাকালে সে একটি অতি প্রিয়-দর্শন যুবকের প্রলুব্ধ হাতে নিস্পৃহভাবে কাপড় বসাইয়া দিয়াছিল। তাহা লইয়া সে কি গণ্ডগোলের সূচনা—থানায় পর্য্যন্ত তাহাদের যাইতে হইয়াছিল। ব্যাপারটা বেশি দূর আর গড়ায় নাই। থানা হইতেই তাহাদের মুক্তি মিলিয়াছিল।

গত বৎসরের ঘটনা মনে জাগিতেই কৃশানু সন্ত্রস্ত হইয়া ওঠে। আবার কি বিচিত্র দুর্ঘটনা যে ঘটিয়া যাইবে তাহা কে জানে। কৃশানু তাড়াতাড়ি কোমরের কাছে শাড়ীর নিচে একপাশ করিয়া হাত রাখিয়া দাঁত দিয়া দাঁত চাপিয়া মনে মনেই একটু হাসে। আর বিস্মিত হইয়া সে ভাবে, মানুষ তাহার প্রতি এত প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে কেনই বা চায়? আর, তাহার

সান্নিধ্যের জন্য মানুষ কেনই বা এত লালায়িত হইয়া ওঠে ? কেনই বা তাহারা স্বস্তিতে তাহাকে থাকিতে দেয় না ? যে জগতে তাহার কোনই কামনা নাই, সে জগতের মানুষ অসঙ্কোচে কেমন করিয়া তাহারই কাছে নামিয়া আসে ? বেশ বোঝে সে, অন্যায় তাহাদের এই প্রচেষ্টা এবং তাহারও প্রতিরোধ করাই ধর্ম্ম।

কৃশানু মুহূর্ত্তে আবার নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলে, এখনও তোর সব জিনিস তোলা হ'লো না লাইলি ? চেরাগটা জ্বেলে সব দেখে দেখে তোল, নইলে কি ফেলে যাবি তা কে জানে।

লাইলি বলে, চেরাগ যে জ্বালবো, শলা কোথায় ?

বেদিয়া যুবকটি বলে, শলার বাক্স বুঝি না'য়েই রেখে এসেছিস্ ? তবে [illegible] সঙ্গে এনেছিস্ কেন ? আচ্ছা, না' থেকে ছুটে নিয়ে আসি, বোস তোরা।

বলিয়াই যুবকটি চলিয়া যায়।

যুবকটির সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মাধব ঠাকুর ও প্রিয়নাথ বেদিয়া মেয়েদের সামনে দিয়াই অন্যদিকে চলিয়া যায় এবং যাওয়ার মধ্যেই কি যেন অব্যক্ত একটা ইঙ্গিত রাখিয়া যায়। কৃশানুই একমাত্র তাহা বোঝে, কিন্তু শঙ্কা তাহার তখন কাটিয়া গেছে প্রায়। কাজেই বিশেষ বিচলিত আর হয় না।

যুবকটি নৌকা হইতে একটা দিয়াশলাই লইয়া আবার অল্পকাল মধ্যেই ফিরিয়া আসে। একটা কেরোসিনের লম্ফ জ্বালিয়া তাহারা তাহাদের কাজ শেষ করে।

তিনটি ঝাঁপি লইয়া তিনটি বেদিয়া মেয়ে ও যুবকটি কেরোসিনের লম্ফ হাতে তাহাদের আগে আগে পথ দেখাইয়া যখন নৌকায় ফেরে তখন হাট প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। শুধু স্থায়ী

দোকানগুলির মধ্যে তখনও আলো জ্বলিতে থাকে ও অস্পষ্ট গুঞ্জন যেন ধ্বনিত হয়। তাহাতে নিস্তব্ধতা আরও নিবিড়তা লাভ করে।

ফাঁকা চাঁদ তখন হাটের শিয়রের সুউচ্চ অশ্বত্থ গাছের মাথায় উঠিয়া পড়িয়াছে। মদালস আঁখিতে সে যেন চাহিয়া আছে।

মস্ত দুইটি বেদিয়া নৌকা পাশাপাশি হাটের গায়েই লাগানো রহিয়াছে। একটি নৌকার 'পরে উনান ধরিয়াছে, রান্না চাপিয়াছে। দুইটি নৌকায় দুইটি কেরোসিনের লম্ফ জ্বলিতেছে। নৌকার ছইয়ের সঙ্গে তার দিয়া লম্ফ দুইটি ঝুলানো। লম্ফের আলোর শিখাটা কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠিয়াই ধোঁয়ায় রূপান্তরিত হইয়া একটা গোল টিনের পাতের গায়ে গিয়া ঠেকিতেছে। তারের সঙ্গেই গোল টিনের পাতটি ফুটা করিয়া লাগাইয়া রাখা হইয়াছে ধোঁয়া ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য. কিন্তু বহুদিনের ব্যবহারে ছইয়ের ভিতরের খানিকটা অংশও কালি মারিয়া গেছে ধোঁয়া লাগিয়া লাগিয়া।

নৌকার কাছেই হাটের ডাঙ্গার 'পরে একটা মাদুর বিছাইয়া বসিয়া বেদিয়াদের মধ্যে কয়েকজন গল্প-গুজব করিতেছে; একটি বৃদ্ধ বেদিয়াকে ঘিরিয়াই সকলে বসিয়াছে। বৃদ্ধ অনর্গল কত কথা বলিয়া চলিয়াছে, সকলে একাগ্রমনে তাহা শুনিতেছে। আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। এমন সময় কৃশানু হঠাৎ সেখান হইতে উঠিয়া একটু সরিয়া গেল। যাওয়ার সময় সে অতি সন্তর্পণে গেল, কিন্তু হাটের সময় যে যুবকটি তাহাদের অবিভাবক হিসাবে কাজের তদারক করিতেছিল তাহার পানে একটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া তাহাকে রীতিমত চঞ্চল করিয়া তুলিয়াই গেল।

কৃশানু একটা গাছের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই যুবকটি পিছন হইতে আসিয়া তাহার চোখ দুইটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

কৃশানু একেবারে তাহার বুকের 'পরেই লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, আঃ! আমার লাগে না বুঝি তুরাণ?

তুরাণ সহসা অপ্রতিভ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

কৃশানু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তুরাণের দুইটি হাত দুই হাতে ধরিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন ছুড়িয়া দেওয়া খোলাম-কুচির মত চতুর্দ্দিকের জল স্থানে স্থানে ছুঁইয়া সুদূরের দিগন্তে গিয়া মিশিল। নিস্তব্ধ হাট চকিত হইয়া উঠিল।

মাস ছয়-সাত হইল মাত্র তাহাদের বিবাহ হইয়াছে। নিভৃতে দেখা হইলেই তাই উচ্ছল আনন্দে তাহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। উদ্দামতার সীমা হারাইয়া ফেলে। এত কাছে পাইয়াও কিছু না পাওয়ার সমারোহে যেন আকুল হইয়া ওঠে। নিমিষে দিশাশূন্য হইয়া অকূল পাথারে ভাসিতে থাকে। দুই কূলে কামনা অপরূপ শতদল হইয়া থরে থরে ফুটিয়া ওঠে।

তুরাণ এক টান মারিয়া কৃশানুকে হাটের অপর প্রান্তে লইয়া আসিল।

কৃশানু বলিল, যাঃ! ওরা কি ভাববে! হয়তো খুঁজতে বেরুবে আবার!

তুরাণ বলিল, তা' হোক। এই সেই অর্জ্জুনপুরের হাট কৃশানু! আজ আবার চাঁদ উঠেছে দেখ্।

কৃশানুর বুকের ভিতরটা কেমন যেন ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

গত বৎসরের কথা তুরাণ সব জানে। তখন ত তাহাদের বিবাহ হয় নাই। আর কৃশানুর সব কথাই যে তুরাণ জানে।

কৃশানু তুরাণের বুকের সঙ্গে নিবিড় হইয়া মিশিয়া দাঁড়াইল।

তুরাণ ক্রীড়া-কৌতুকে সহসা ছুটিয়া পলাইল। কৃশানু কৌতুকে হাসিয়া উঠিয়াই তুরাণকে ছুটিয়া পলাইতে দেখিয়া ঘাসের জমি হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তুরাণ তখন অনেকখানি পথ হাটের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে।

কৃশানু তুরাণের এই ছুটিয়া পলানোর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কাজেই সে একটু বিব্রত হইয়াই পড়িল, কিন্তু ছুটিয়া তুরাণকে ধরিতেও সে চেষ্টা পাইল না। তবে একটু দ্রুতগতিতেই সে হাঁটিতে শুরু করিল। অল্প কয়েক পা অগ্রসর হইতেই একটা দোকানের আড়াল হইতে দুইজন

অপরিচিত ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তেই কৃশানু সামনাসামনি পড়িয়া তাহাদের চিনিল। মাধব ঠাকুর একেবারে কৃশানুর গায়ের উপরেই আসিয়া যেন পড়িয়াছিল। প্রিয়নাথ মাধব ঠাকুরের হাত পাঁচ-ছয় পিছনে ছিল।

চকিত মুহূর্ত্তে কৃশানু দৃঢ়তায় স্পষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়া কোমরের একপাশে হাত চালাইয়া দিয়া কি একটা জিনিস যেন ঝক্ করিয়া তুলিয়া ধরিল মাধব ঠাকুরের সম্মুখে। মাধব ঠাকুর একটা অস্ফুট ভয়ার্ত্ত চমকে কয়েক পা পিছাইয়া দাঁড়াইল। প্রিয়নাথ বহুদূরে সরিয়া গিয়া একটা দোকানের পিছনে দাঁড়াইল।

মাধব ঠাকুর পিছাইয়া গিয়া দেখিল, কৃশানুর হাতে একটা ধারালো চক্‌চকে ছোরা: চাঁদের আলো তাহাতে পড়িয়া ঝকমক্ হিংস্রতায় জ্বলিতেছে! কৃশানুর মুখে তখন অপূর্ব্ব নৃশংসতা জাগিয়াছে।

মাধব ঠাকুর স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল।

কৃশানু তীরবেগে তুরাণ যে-পথে মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে চলিয়া গেছে সেইদিকে ছুটিয়া গেল।

মাধব ঠাকুরের স্তব্ধ-চেতনার সম্মুখে শুধু জাগিয়া রহিল. একটি ধারালো ছোরা—সুস্পষ্ট, কঠিন ও ক্রূর।....

হাট ছাড়াইয়া নৌকা বহুদূর আসিয়া পড়িয়াছে।

প্রিয়নাথই এতক্ষণ নৌকার বৈঠা টানিতেছিল, আর মাধব ঠাকুর কেমন যেন স্তব্ধ হইয়া একপাশে বসিয়া ছিল। প্রিয়নাথের এ নীরবতা অসহ্য মনে হইল। মুহূর্ত্তে তাই সে জল হইতে বৈঠাটা নৌকার 'পরে টানিয়া তুলিয়া রাখিয়া মাধব ঠাকুরের কাছে গিয়া তাহার দুই পা একেবারে আকুল হইয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ঠাকুর, আমার অপরাধ হ'য়ে গেচে, এবারটি মাপ করো। জীবনে আর যদি কখনও মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলি! আমার যথেষ্ট শিক্ষা এ ব্যাপারে হ'য়ে গেচে।

মাধব ঠাকুরের সম্বিৎ এতক্ষণে যেন আবার ফিরিয়া আসিল। সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, দূর, তোর আর দোষ কি। তোর গপ্‌প কি আমি বিশ্বাস করেচি নাকি! আর ও মেয়েকে তো আমরা জানি, গোবিন্দপুরের গোলইয়ার মেলায় তোর সঙ্গে ওর ঢলা-ঢলি যে বানিয়ে বলা নিছক গপ্‌প সেতো আমি জানিই। কিন্তু কি যেন ওর মধ্যে আছে মাইরি, মানুষকে সমস্ত বিপদ ভুলিয়ে কাছে টেনে নেয়। আশ্চর্য্য! সব জেনে শুনেই তো গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লাম! কিন্তু একটা মেয়ে দেখলাম বটে জীবনে। বাপ রে বাপ! মেয়ে তো নয়, যেন ধারালো ঝক্‌ঝকে একখানা ছোরা, এখনও যেন চক্ মক্ ক'রে জ্বলচে আমার চোখের সামনে।

পরাজিত যোদ্ধা

সামান্য কারণে ও বেশি সময়ই অকারণে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ফেরাই চণ্ডীদাসের একমাত্র কাজ। দুনিয়ায় আর কোন কাজ যে তাহার আছে এমন মনে হয় না। আর থাকিলেও সেজন্য তাহার কিছুমাত্র মাথা ব্যথা নাই। কেহ সে কথা ভয়ে তোলেও না, যেহেতু তুলিলেই বিপদ! রণোন্মাদ চণ্ডীদাস কাহাকেও কখনও ছাড়িয়া কথা কয় না। অকারণ চোট-চাপটেই তাহার দিন কাটে। সহজ অবস্থায়ই কণ্ঠস্বর তাহার রাস্তার উপরের দোকানগুলির রেডিওর আওয়াজ স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অবস্থা বিপর্য্যয়ে তো আর কথাই নাই। কবে নাকি তাহার একটা ধমকে তাহার দূরসম্পর্কের এক পিসিমার বোনঝির কানে তালা লাগিয়া গিয়াছিল, অনেক চিকিৎসার পরে কাণ তাহার ভাল হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। চণ্ডীদাস কণ্ঠের জোরে এবং সতেজ অঙ্গচালনার দ্বারাই সকলকে দাবাইয়া রাখিয়াছে। আর যাহার দ্বারা সে সকলকে বিশেষ রকমে কাহিল করিয়া রাখিয়াছে তাহা তাহার বুদ্ধিবৃত্তির একান্ত দীনতা। বুদ্ধির দ্বারা লোককে পরাজিত করা যায় সত্য, কিন্তু বুদ্ধিহীনতার দ্বারাই সে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছে। চণ্ডীদাসের কথাবার্ত্তা শুনিলে হতাশ হইতে হয়, কিন্তু হতাশা প্রকাশ করিলে আর রক্ষা নাই। সর্ব্বক্ষণ রণমূর্ত্তি সে ধরিয়াই আছে।

সেদিন রাত দশটার পরে পাড়ার শান-বাধানো গলিটির যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকার কথা তখন সহসা চণ্ডীদাস একটা লাঠি হাতে একাই নামিয়া পড়িল গলির বুকে এবং মুহূর্ত্তে গলিটিকে রণাঙ্গণে রূপান্তরিত করিল। ইহা একমাত্র চণ্ডীদাসের দ্বারাই সম্ভব।

আশে-পাশের বাড়িগুলির অন্তরে একটা আতঙ্ক জাগিল, হায়! চণ্ডীদাস ক্ষেপিয়াছে!

কিন্তু চণ্ডীদাস উন্মাদ নয়,—সে রণোন্মাদ!

সামান্য ব্যাপারকে অসামান্য করিয়া তুলিতে চণ্ডীদাস অদ্বিতীয়। শীতের রাত্রি, পাড়া নিস্তব্ধপ্রায়, চণ্ডীদাস একা রণে মাতিয়া উঠিল। পাড়া-প্রতিবেশীর তন্দ্রাজড়িমা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। কিন্তু গলিতে তখন একা চণ্ডীদাস অনির্দ্দিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে লাঠি তুলিয়া ধরিয়া চিৎকার করিতেছে, কে বলেচে চণ্ডীদাস উন্মাদ শুনি? কার ঘড়ে ক'টা মাথা আছে দেখি। বলুক না একবার বেরিয়ে এসে আমার সাম্‌নে সেকথা, দেখি, মাথা তার চৌচির না হ'য়ে থাকে কেমন ক'রে? কই, আসুক না দেখি আমার সাম্‌নে। বলুক না দেখি আবার সেই কথা। কা'র বুকের পাটা কতখানি একবার দেখে নি, সাহস থাকে বেরিয়ে এসে ল'ড়ে যাক্। বুঝো যাক্ চণ্ডীদাসের মুরোদ। ড্যাম কাওয়ার্ডস্ যত!··· ইত্যাদি।

চণ্ডীদাস অনর্গল কণ্ঠ কিছুমাত্র না নামাইয়াই বলিয়া চলিল, আর মুহুর্মুহু আক্ষেপে ও বিক্ষোভে লাঠি চালনা করিতে লাগিল। গলির গ্যাসের আলোয় চণ্ডীদাসের সে রণমূর্ত্তি চমৎকার দেখাইতেছিল। অনেকেই দ্বিতলের জানালা খুলিয়া চণ্ডীদাসের সে মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অকাল-নিদ্রাভঙ্গ-জনিত ক্লেশ ভুলিয়া গেল। একটা দর্শনীয় দৃশ্য উপভোগ করিতে পাইয়া নিজেদের কৃতার্থ বোধ করিল, কিন্তু দ্বিতলের জানালায় দাঁড়াইয়াও কেহ সাহস করিয়া কোন সাড়া শব্দ দিতে পারিল না। এমন কি, কাশি উঠিয়া কণ্ঠাগ্রে রীতিমত পীড়ণ শুরু করা সত্ত্বেও কেহ কাশিয়া নিজের উপস্থিতি জ্ঞাপন করিতে পারিল না।

মিনিট কুড়ি-পঁচিশ অনর্গল বকিয়া বকিয়া পাড়ায় মহা আলোড়ন ও উৎকণ্ঠা জাগাইয়া চণ্ডীদাস থামিল। পাড়ার উপর দিয়া একটা মস্ত ঝড় বহিয়া গেল যেন, তারপরে সমস্তই আবার নীরব। একজনও গলিতে

বাহির হইয়া আসিল না। চণ্ডীদাসের যুদ্ধঘোষণা কেহ গ্রাহ্য করিল না; কারণ, গ্রাহ্য করিলেই সমূহ বিপদ! শুধু শুনিয়া যাওয়াই ভাল।

দ্বিতলের জানালাগুলি একটির পর একটি সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল এমনভাবে যেন তাহারা বলিতে চাহিল. সাবাশ চণ্ডীদাস!

শ্যামাদাস ও চণ্ডীদাস দুই ভাই। শ্যামাদাস চণ্ডীদাসের বছর তিন চারের বড। আর তাহাদের একটি ভগিনী আছে, নাম তাহার ভুবনেশ্বরী. কিন্তু ভুবন নামেই সে সবার কাছে পরিচিত। ভুবনের বিবাহ হইয়াছে বরানগর; শ্বশুরালয়েই সে বাস করিতেছে। কলিকাতার এত কাছে থাকিয়াও ভাইয়ের বাড়ি সে বছরে একবারও আসে কিনা সন্দেহ। তাহার শ্বশুরবাড়ির সংসার নাকি মস্ত সংসার. ছুটি কিছুতেই মেলে না।

শ্যামাদাস ও চণ্ডীদাস পৈতৃক বাড়িতেই বসবাস করিতেছে। পিতৃদত্ত সম্পত্তির মধ্যে ঐ বাড়িটিই সম্বল, আর সংসার চলে শ্যামাদাসের রোজগারে। অবশ্য, শ্যামাদাসের চাকুরিটিও পিতৃদত্ত। কেন না, পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতার উমেদারিতেই এই চাকরি --শ্যামাদাস মার্চ্চেণ্ট অফিসের কেরাণী এবং পিতা ছিলেন সেই অফিসের প্রধান ক্যাশিয়ার। শ্যামাদাস আই-এ ফেল করিয়া চাকুরিটি কিন্তু ভালই পাইযাছে। শ্যামাদাসের স্ত্রীর নাম মালতীলতা। শ্যামাদাসের দুইটি কন্যা ও একটি পুত্র। কন্যারাই বড় এবং পুত্রটি সর্ব্বকনিষ্ঠ। শ্যামাদাস বড় মেয়ের নাম রাখিয়াছে ছায়া ও পরেরটির নাম মায়া এবং পুত্রের নাম ভোম্বল।

ভোম্বল চণ্ডীদাসের অত্যন্ত ভক্ত। কাকার সঙ্গেই তাহার যাহা কিছু গভীর বাক্যালাপ চলে।

সেরাত্রে চণ্ডীদাসের চিৎকারে ভোম্বলেরও ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাত্রে কাকার দেখা আর মেলে নাই। কাজেই সকালবেলা কাকার

সঙ্গে দেখা হইতেই ভোম্বল প্রশ্ন করিয়া বসিল, কাল লাত্তে অত তিংকার করথিলে কেন ?

চণ্ডীদাস বলিল, আমার খুশি, তুই চুপ কর্ হারামজাদা।

ভোম্বল অভিমানে বলিল,আত্থা !

শ্যামাদাস তাহাদের কথা শুনিয়া বলিল, ভাল কথা চ'ণ্ডে, কাল রাত্তিরে ওভাবে যে হল্লা করছিলি, তা'তে পাড়ারলোকের ঘুমের ব্যাঘাত হয় না ? লোকেই বা ভাবে কি বল্তো ?

চণ্ডীদাস প্রথম কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল, তারপরে বলিল, ঘুমের ব্যাঘাত হয় বুঝি ? পাড়ার সাত-সাতটা বাড়িতে সারারাত রেডিও চলতে পারে, গ্রামোফোন বাজতে পারে, তাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, আর আমার এই ন্যায্য চিৎকারেই যত সবার ঘুমের ব্যাঘাত হয় ? তা হয় তো হোক্গে, আমি আমার যত খুশি চিৎকার করবো, তাদের ক্ষ্যামতা থাকে বাধা দিক্।

শ্যামাদাস একটু বিব্রত হইয়াই যেন বলিল, তা বাপু কে না কে, কি বলেচে, তাই নিয়ে কি অত হল্লা করা উচিত ? আর ভদ্রলোকের পাড়ায় রাত দুপুরে ওসব হল্লা-চিৎকার হওয়া কি ভাল ?

চণ্ডীদাস বলিল, চিৎকার হল্লা কি আমি জোরে করেচি, শুনেচো কি তা কখনও ? এই সামান্য কারণেই যদি ভদ্রলোকের পাড়ার জাত গিয়ে থাকে তো যাক্গে'। আর, আমি কথা কইলেই যত চিৎকার হ'য়ে যায় ? কেন, সেদিন যে পাল ম'শায় তার বাড়ির ঝি'টাকে লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে এলো গলির মুখ পর্য্যন্ত, আর সে যে—ওরে বাবারে ! মেরে ফেললেরে !—বলে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়লো, সেটা বুঝি খুব ভদ্রপাড়ার নমুনা হ'লো ? কেন, তখন বলতে পারোনি পাল ম'শায়কে ? আর পাল ম'শায়ের তো কম ক'রেও আমার চেয়ে প্রায় এক কুড়ি বয়েস বেশি হবে। তার কি আক্কেলটি শুনি ?

শ্যামাদাস ইহার সত্যই কোন জবাব দিয়া উঠিতে পারিল না।

চণ্ডীদাস যতই অবুঝ হউক্ না কেন, সে তাহার দাদাকে একটু সমীহ করিয়া চলে ঠিকই, কিন্তু সবসময় তা' বলিয়া আর অত হিসাব করিয়া চলা যায় না। চণ্ডীদাস তাহা পারেও না। মাঝে মাঝে তাহার মাথায় কেমন যেন একটা খুন চাপিয়া যায়, কিছুতেই নিজেকে আর ঠিক রাখিতে পারে না। এমন কি, শ্যামাদাসকেও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করে। কিন্তু নিরীহ প্রকৃতির মানুষ শ্যামাদাস, অমনি সভয়ে পিছু হটিয়া দাঁড়ায়। কারণ, কাণ্ডজ্ঞানহীন চণ্ডীদাসকে সে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতে পারে না।

হেন যে চণ্ডীদাস তাহারও অমোঘ অস্ত্র একটি আছে, আর তাহার সন্ধান রাখে একমাত্র মালতী।

কাজেই চণ্ডীদাস যখন সত্যই বাড়াবাড়ি শুরু করে তখন মালতী বলে, ঠাকুরপো, আরতো পারি না, চাকরটাকে পাঠিয়ে দি মাধবীর ওখানে, আর ওবেলা তা'কে আসতে লিখে দি,' কি বলো?

চণ্ডীদাস মহা বিপন্ন হইয়া বলে, না বৌদি, দয়া ক'রে ওকাজ করো না, তাহ'লে এই মুহূর্ত্তেই আমি বাড়ি ছেড়ে পালাবো।

মাধবীলতা মালতীরই ছোট বোন। বৎসরখানেক হইল তাহারও বিবাহ হইয়াছে এবং কোন ভাল ঘরে ও বরেই সে পড়িয়াছে। মাধবীর স্বামী চিরঞ্জীব যেমন ভাল চাকুরি করে, তেমন আবার সে বড় ঘরের ছেলে। চিরঞ্জীব মাঝে মধ্যে মাধবীকে সঙ্গে লইয়া নিজেই বাড়ির মোটর হাঁকাইয়া মালতীর সঙ্গে দেখা করিতে আসে। চণ্ডীদাস বাড়িতে মাধবীর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই উধাও হইয়া যায় একেবারে নিঃশব্দে এবং রাত্রি অধিক হইলে তবে চুপি চুপি বাড়ি ফেরে পলাতক আসামীর মত অতি সন্তর্পণে।

মাধবীকে তাহার এত ভয়ই বা কিসের? কখনও কোন গভীর বা

মারাত্মক কিছুই ঘটে নাই, যে কারণে মাধবীকে তাহার এমন ভয় করিয়া না চলিলে চলে না। তথাপি চণ্ডীদাসের ভয়। চণ্ডীদাস ভূভারতের যে কোন ব্যক্তিকে সম্মুখ-সমরে আহ্বান করিতে পারে এবং নিতান্ত অপ্রয়োজনেও রণমূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে, কিন্তু পারে না শুধু মাধবীর বেলায়ই। মাধবীর নাম শুনিলেই তাহার থরহরি কম্প দেখা দেয়, কেমন নির্জ্জীব নির্ব্বিষ হইয়া পড়ে।

চণ্ডীদাস মাধবীর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত।

দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা। মাধবীর তখনও বিবাহ হয় নাই। মাধবী একদিন তাহাদের বাড়ি বেড়াইতে আসিয়াছিল। চণ্ডীদাস মাধবীকে দেখিয়া তাহার প্রস্থানের পরে মালতীকে বলিয়াছিল, বৌদি, তোমার বোনের এত রূপ কেন বলোতো?

চণ্ডীদাসের প্রশ্ন একটু বিসদৃশই হইয়াছিল, কিন্তু মালতী বলিয়াছিল, তা'তো ঠিক জানিনে ঠাকুরপো, তবে হ'তে পারে তোমাকে ধরবার জন্যই হয়তো।

চণ্ডীদাস সে কথা শুনিয়া যে হাসি হাসিয়াছিল সেদিন তাহা চেষ্টা করিয়া মানুষ হাসিতে পারে না।

চণ্ডীদাস শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল, হতভাগ্য চণ্ডীদাস কি আর অতভাগ্য নিয়ে জন্মেচে বৌদি!

মালতী কিন্তু চেষ্টা করিয়াও চণ্ডীদাসের ভাগ্য ফিরাইতে পারে নাই। মালতীর পিতা চণ্ডীদাসের হাতে মাধবীকে দিতে রাজি হয় নাই এবং কারণ দর্শাইয়াছিল অবশ্য যে, একঘরে দুই মেয়ের বিবাহ দেওয়ায় তাহার ঘোরতর আপত্তি আছে। মালতী পিতার কোন দোষ ধরিতে পারে নাই।

চণ্ডীদাস হতভাগ্যই! মালতী চেষ্টা করিয়াও চণ্ডীদাসকে অন্য বিবাহে রাজি করাইতে পারে নাই।

সেই হইতে চণ্ডীদাস এমনই রণোন্মাদ।

কখন যে কোন সামান্য কারণে বা অকারণেই মহাপ্রলয় বাধাইয়া তোলে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই।

শ্যামাদাস বলিয়া বলিয়া আর পারে না। শ্যামাদাস এযাবৎ বহু চেষ্টা করিয়াছে চণ্ডীদাসকে কোন একটা কাজে ভিড়াইয়া দিবার জন্য। তাহা হইলে যদি বা তাহার মতিগতির কিছু পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সুযোগ যদি বা জোটে তো চণ্ডীদাসকে সে কিছুতেই রাজি করাইতে পারে না। আর যে চাকরির কথাই তাহাকে বলা হয়, সে বলে, ওকাজ আমাকে দিয়ে হবে না।

কি কাজ যে তাহাকে দিয়া হইবে তাহা শ্যামদাস কিছুতেই আর ভাবিয়া পায় না. আবার বেশি কিছু গরজ দেখাইলেই চণ্ডীদাস বলে, তার চেয়ে পরিষ্কার ক'রে বললেই তো আমি বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাই।

ইহার পরে বলিবার আর কিই বা থাকে। শ্যামাদাস ভাইয়ের ভবিষ্যৎ ভাবা তাই ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন বর্ত্তমান লইয়াই বিব্রত আছে। কারণ. কখন কি যে চণ্ডীদাস করিয়া বসিবে তাহার কিছুই ঠিক নাই।

সেদিন পাল ম'শায়ের সহসা কি দুর্ম্মতি দেখা দিল, সে আসিয়া চণ্ডীদাসকে বলিল, বলি, চাকরি-বাকরির চেষ্টা কিছু করচিস্ কি চণ্ডী? না, এভাবে চব্বিশ ঘণ্টা ঋণে মেতে থাকলেই চলবে? বাজার খুবই খারাপ স্বীকার করি, তাহ'লেও চেষ্টাতো করতেই হবে। সাধনা থাকলেই সিদ্ধি।

চণ্ডীদাস সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় রুখিয়া উঠিল, বলি, আপনি কে? আপনি আমাকে সেকথা বলবার কে শুনি? আমার শ্বশুরের স্যাঙ্গাৎ যেন, এলেন বিচক্ষণ, তার আবার পরামর্শ ফলানো হচ্ছে! আর বাবা যদি আপনাকে গার্জ্জেন য়্যাপয়েণ্ট ক'রে যেতেন, তাহ'লেও না হয় কথা ছিল। যান্, যান্, ঘরে ব'সে উপদেশ ফলান গিয়ে।

পাল ম'শাই রীতিমত স্তম্ভিত হইয়া গেল। চণ্ডীদাসের নিকট এতখানি ঔদ্ধত্য সে একেবারেই আশা করে নাই। অপমানে ও ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর একেবারে রী রী করিয়া উঠিল। যে শ্যামাদাস তাহাকে অত্যন্ত সমীহ করিয়া চলে সেই শ্যামাদাসের সহোদরের কিনা এই কথা! পাল ম'শাই একেবারে হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিল, উল্লুক, তুমি যে এতবড় গাধা হয়েচো তা'তো আমার জানা ছিল না! তা'হ'লে কি আর যাই তোমার ভাল করতে।

চণ্ডীদাস বলিল, গাল মন্দ করবেন না পাল ম'শাই, মেজাজ আমার খারাপ হ'য় গেলে হয়তো মেরেই বসবো, তখন আর খাতির করবো না কাউকে। সাম্‌লে কথাবার্ত্তা বলবেন। আমার আর ভাল ক'রে আপনার কাজ নেই, নিজের ভাল করতে করতে তো পৈতৃক সম্পত্তি নীলেমে তুলে ছেড়েচেন।

পাল ম'শাই অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াই সেস্থান পরিত্যাগ করিল। কারণ, চণ্ডীদাসের শেষ আঘাত অতি নির্ম্মম হইয়াই তাহার প্রাণে বাজিল।

পাল ম'শায়ের প্রস্থানের পরে চণ্ডীদাস আরও উদ্দাম হইয়া উঠিল। একা একাই সে গলির উপরে দাঁড়াইয়া পাল ম'শায়ের অতীতের বহু আলোচিত মাতলামির বিস্মৃতপ্রায় কাহিনীগুলি আবার সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। চণ্ডীদাস তখন একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে। হল্লা-চিৎকারে পাড়া একেবারে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল।

ছায়া, মায়া ও ভোম্বল একজনের পর একজন মালতীর নির্দ্দেশে চণ্ডীদাসকে হাত ধরিয়া টানিয়াও বাড়িতে আনিতে পারিল না। মালতী নিজেও বহুবার সদর দরজা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চণ্ডীদাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইল। কিন্তু সকলই বৃথা হইল।

চণ্ডীদাস উন্মত্ত আস্ফালনে গলির মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল একটা পিঞ্জরাবদ্ধ জানোয়ারের মত।

মাধবীর আগমন কেহ প্রত্যাশা করে নাই। কিন্তু মাধবীকে গলির মুখে মোটর হইতে নামিতে দেখিয়া মালতী অত্যন্ত খুশি হইয়া গেল। মাধবীর সঙ্গে তাহার ঠাকুরপো, সঞ্জীব আসিয়াছে।

চণ্ডীদাস সজ্ঞানে ছিল না বলিলেই চলে। মাধবীর ভাগ্যে তাই আজ রণাঙ্গনেই চণ্ডীদাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়া গেল।

মাধবী একেবারে চণ্ডীদাসের কাছে আসিয়া বলিল, চণ্ডীদা, বাড়ি চলো, আর একা একা কত লড়বে?

চণ্ডীদাস মুহূর্ত্তে নির্জ্জীব নিশ্চুপ হইয়া গেল। পাষাণেও যেন অতখানি স্তব্ধতার আভাস মেলে না।

মাধবী চণ্ডীদাসের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। চণ্ডীদাস কোনই প্রতিবাদ করিতে পারিল না। মাধবী চণ্ডীদাসকে হাত ধরিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। চণ্ডীদাস যন্ত্র-চালিতের মত তাহার অনুসরণ করিল। মালতী সঞ্জীবকে সাদরে বাড়ির মধ্যে ডাকিয়া লইয়া মাধবীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তুই এসে প'ড়ে আমাকে বাঁচিয়েচিস্ মাধবী, নইলে আমার কি সাধ্য ঠাকুরপোকে ডেকে আনতে পারি।

মাধবী নীরবে হাসিল।

মালতী চণ্ডীদাসের মুখের পানে চাহিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল। কে বলিবে যে এমন শান্তশিষ্ট লোক আবার মুহূর্ত্তকয়েক পূর্ব্বেই চিৎকারে পাড়া মন্থিত করিয়া তুলিয়াছিল। চণ্ডীদাসের মুখের পানে চাহিয়া মালতীর মনে হইল, পাষাণে যেন কাতরতা জাগিয়াছে। চণ্ডীদাসের সে মূর্ত্তি দেখিয়া মালতীর চোখে অকারণে আজ জল আসিয়া গেল।

শ্যামাদাস ও মালতী পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল যে, মাধবীকে দিয়া চণ্ডীদাসকে বলাইলে হয়তো সে একটা কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে পারে।

মাধবীই যেন চণ্ডীদাসকে ঘায়েল করিবার একমাত্র অস্ত্র। কাজেই শ্যামাদাস মাধবীকে একদিন সাড়ম্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়িতে আনিয়া খাওয়াইল। এবং মালতী কথায় কথায় সে কথা পাড়িয়া বসিল। মাধবী সহজেই রাজি হইল, যদিও পাল ম'শায়ের দুর্গতির কথা তাহার জানাই ছিল।

মাধবী সহজভাবেই চণ্ডীদাসকে বলিল, চণ্ডীদা, এমন ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়ানো তোমার আর ভাল দেখায় না. এইবার একটা চাকরি বাকরি জুটিয়ে বিয়ে-থা' ক'রে সংসারী হও!

চণ্ডীদাস লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। সে আর মাথা তুলিয়া উত্তর দিতে পারিল না।

সকলেই ভাবিল, কাজ হইল এতদিনে যেন, সাপের ওঝা মিলিয়াছে। চণ্ডীদাস এইবার নিশ্চয়ই উদ্যোগী হইবে। শ্যামাদাসের ও মালতীর একটা দুশ্চিন্তা কাটিল।

কিন্তু ফল ফলিল ঠিক উল্টা। কেহ তাহা কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। চণ্ডীদাস সহসা নিরুদ্দেশ হইল।

একদিন, দুইদিন···তিনদিন কাটিয়া গেল, চণ্ডীদাস তবু বাড়ি ফিরিল না। শ্যামাদাস মহা দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল। মালতী কান্না জুড়িতে শুধু বাকী রাখিল।

চারদিনের দিন শ্যামাদাস বরানগরে ভুবনেশ্বরীকে এই দুঃসংবাদ পাঠাইল এবং কাগজে একটা নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন প্রেরণ করিল। মাধবী আগেই শুনিয়াছিল, শুনিয়া সে মর্ম্মাহত হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বরী সংবাদ পাইয়া ভাইয়ের বাড়ি আসিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল এবং আর সকলকে প্রায় অস্থির করিয়া তুলিল।

পরদিনের কাগজেই নিম্নলিখিত মর্ম্মে নিরুদ্দেশ বিজ্ঞাপন ছাপা হইল :—

নিরুদ্দেশ !

আমার ভ্রাতা শ্রীমান চণ্ডীদাস বর্ম্মণ, বয়স ২৭, রং তামাটে, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চোখ ভাসা ভাসা, গোল-গাল ভরা স্বাস্থ্য, চুল সমান করিয়া ছাঁটা, বাঁহাতে মাদুলী, ডান চোখের নিচে মস্ত কাটা দাগ, মাথায় বেশ ছিট আছে, প্রায় উন্মাদ—গত শুক্রবার নিরুদ্দেশ হইয়াছে। যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি সংবাদ দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

স্বাঃ শ্যামাদাস বর্ম্মণ
৩১।৭।১ গোবিন্দ ঘোষাল লেন,
ভবানীপুর।

নিরুদ্দেশ-সংবাদ কাগজে বাহির হওয়ার পরের দিনই সকলকে বিশেষ চমকাইয়া দিয়া চণ্ডীদাস আসিয়া হাজির। কেহ সংবাদ দেয় নাই, কেহ খুঁজিয়া পায় নাই, চণ্ডীদাস নিজেই আসিয়াছে।

শ্যামাদাস আনন্দের আতিশয্যে চোখে জল লইয়া আসিয়া একেবারে চণ্ডীদাসের সাম্‌নে দাড়াইল।

চণ্ডীদাস সহসা পীড়িত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এতদিনে তুমি এই বুঝলে দাদা যে, আমি উন্মাদ? আমি তারই প্রতিবাদ করতে এলাম শুধু। আর আশ্চর্য্য, কাগজে কাগজে তুমি সেই কথা কিনা ছেপে ফিরচো। আমাকে যারা উন্মাদ মনে করে তারাই প্রকৃত উন্মাদ।

শ্যামাদাস চণ্ডীদাসকে বুকের কাছে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ওসব ভুলে যা চ'ণ্ডে, তোর সন্ধান না পেলে আমি সত্যিই উন্মাদ হ'য়ে যেতাম। কি কষ্টই যে আমাকে দিয়েচিস্ এ ক'দিন!

চণ্ডীদাস শ্যামাদাসকে ঠেলিয়া সরাইয়া বলিল, না, না, এখানে আর আমি এক মুহূর্ত্তও থাকবো না, শুধু প্রতিবাদ ক'রেই চলে যাবো। জানিয়ে যাবো যে, আমি উন্মাদ নই।

সকলে চণ্ডীদাসকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু চণ্ডীদাস কিছুতেই থাকিবে না। চণ্ডীদাসকে তখন উন্মাদের মতই দেখাইতেছিল। বেশবাস ধুলিমলিন. চুলগুলি রুক্ষ, চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া আছে অনিদ্রা ও অনাহারের কালিমা।

চণ্ডীদাস সকলের আবেষ্টন হইতে ছিটকাইয়া বাহির হইয়া গেল এবং দরজা পর্য্যন্ত গিয়া পৌছাইতেই মালতী সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল, মাধবা, ও-মাধবী, শীগ গিরই ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আয়!

চণ্ডীদাস দরজার কাছেই নিস্পাণ দাঁড়াইয়া গেল। এক পা'ও যেন তাহার আর নড়িবার শক্তি নাই। চণ্ডীদাসের কিছু পূর্ব্বেই মাধবী চণ্ডীদাসের সংবাদ নিতেই এবং দিদির সঙ্গে দেখা করিতে এ-বাড়ি আসিয়াছিল। আসিয়া আবার দিদির ঘরেই সে বসিয়া ছিল। চণ্ডীদাসের আগমন টের পাইয়াও সে বাহিরে আসে নাই। দিদির আহ্বানে প্রথম বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই চণ্ডীদাস একবার চোখ তুলিয়া মাধবীর পানে তাকাইল। তারপরেই কেমন একটা চিৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

শ্যামাদাস ছুটিয়া আসিয়া চণ্ডীদাসের পাশেই মাটিতে বসিয়া পড়িয়াই তাহার মাথাটা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া বলিল, ভুবন. জল নিয়ে আয় শীগ্‌গির, চণ্ডের ছেলেবেলাকার ফিটের ব্যামোটা বুঝি আবার এতদিন পরে দেখা দিল।

মালতী নিজেই জল আনিতে ছুটিয়া গেল, ভুবনেশ্বরী গিয়া দাদার পাশে বসিল, আর মাধবী নিতান্ত অপরাধিনীর মত বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।